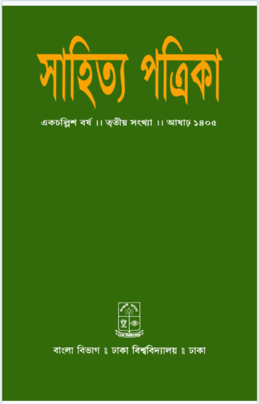

Vol. 41 | No. 3 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভারতীয় দর্শনের বিকাশে প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব

Volume	41
Issue	3
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো: মতিউর রহমান
Published online	June 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i3.5
Pages	163-212
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ভারতীয় দর্শনের বিকাশে প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব

মো: মতিউর রহমান*

ভারতীয় দর্শনের সূচনা কাল থেকেই এখানে প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক নামে পৃথক দুটি ধারা প্রবহমান। প্রথমটির উৎস অবৈদিক বা প্রাক-বৈদিক সভ্যতা। আর শেষেরটির উৎস বৈদিক সাহিত্য, প্রচলিত অর্থে এই বৈদিক সাহিত্যকেই ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির একমাত্র উৎস বলে মনে করা হয়।[১] এ ক্ষেত্রে বেদকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয় এবং আগমশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ও সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র এবং শিল্পকলাকেও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে বৈদিক সাহিত্যের কোনো অংশেই আগম শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, সঙ্গীতবিদ্যা এবং শিল্পকলাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো যায় না। তাই ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশে বৈদিক সাহিত্যের অবদানের মতো প্রাক-বৈদিক জাতি-গোষ্ঠীর সাহিত্যিক অবদানকেও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। এ দিকটির ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে ভারতীয় দর্শন কি প্রাক-বৈদিক সভ্যতার সাথে বৈদিক সভ্যতার সংমিশ্রণের পরিণাম, না-কি বৈদিক সভ্যতার সাথে প্রাক-বৈদিক সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল? এ ব্যাপারে আমরা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে না পারলেও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি যে কেবল বৈদিক সাহিত্যের কিংবা কেবল প্রাক-বৈদিক সভ্যতার সরল বিকাশ নয়, একথা অবশ্যই স্বীকার্য।[২] তাই ভারতীয় দর্শনকে তার সামগ্রিক প্রেক্ষিত থেকে বুঝতে হলে প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক উভয়বিধ ভিত্তির ওপর যুগপৎ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. বৈদিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই আস্তিক্যবাদী ষড়দর্শন তথা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। আর বেদ যে অপৌরুষেয় তার বিরোধিতা থেকেই লোকায়ত, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি। হিন্দুধর্মে যদিও পরবর্তীকালে তন্ত্রের মাধ্যমে শক্তিপূজা বা শিব-সংহিতার মাধ্যমে শৈবপূজার প্রচলন হয়েছে তবু বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্ব আজো হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে সর্বাধিক।

২. সুনীলকুমার দাস, *প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকদর্শন*, কলিকাতা, ১৭৭৪, পৃ. ৯

ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রাক-বৈদিক ও বৈদিক সাহিত্যের ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন আজ একান্তই অপরিহার্য। বর্তমান প্রবন্ধ এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই আমার এক বিনীত প্রয়াস।

প্রাক-বৈদিক সভ্যতা

এখন প্রশ্ন হলো প্রাক-বৈদিক সভ্যতা বলতে আমরা কী বুঝি? সহজ কথায়, আর্য বা বৈদিক সভ্যতা ব্যতীত অন্যান্য যে সভ্যতাগুলো ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করেছে, আধুনিক বিদ্বানরা তাদেরকেই অনার্য বা প্রাক-বৈদিক সভ্যতা বলে অভিহিত করেছেন। বিদ্বানদের মতে এদের মধ্যে নেগ্রিটো, অস্ট্রিয়া, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতি এবং সিন্ধু নদের উপত্যকার সভ্যতার নাম অতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা চলে। সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিলো তাকে বলে সিন্ধু নদের সভ্যতা। সিন্ধু নদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এরকম সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করা গেলেও নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির প্রাক-বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এতো সহজভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আলোচনার সুবিধার্থে একে একে এসব জাতির সভ্যতার স্বরূপ এবং ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে তাদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা যাক।

নেগ্রিটো জাতি

আধুনিক বিদ্বানদের মতে নেগ্রিটো জাতির লোকেরাই প্রথম একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করে। মানবসভ্যতার প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরবর্তী স্তরে এবং মানব সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে ছিলো তাদের অবস্থান।[৩] তারা উচ্চতায় ছিল বেঁটে, রং ছিলো কালো, নাসিকা ছিলো চ্যাপ্টা ও পুরু, ঠোঁট ছিলো পুরু এবং মাথায় ছিলো কোঁকড়া চুল। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সাধারণত এরা বসবাস করতো বলে খাদ্য উৎপাদনে ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই খাদ্য সংগ্রহ করেই জীবন ধারণ করতে হতো তাদের। মাছধরা বা বন্যপশু শিকার করা ছিলো তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম। বর্তমানে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এ জাতীয় লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

---

৩. S. Radhakrishnan., *History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. 1*, London, 1952, পৃ. ৩১

পাকিস্তানের দক্ষিণ বেলুচিস্তান, দক্ষিণ ভারত এবং আসামেও বর্তমানে এ জাতীয় লোকের কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়।

নৃততাত্ত্বিকদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে তীর বল্লমের আবিষ্কার এ জাতির প্রত্যক্ষ অবদান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আজ আমরা বৃক্ষ উপাসনার যে ধারণাটি দেখতে পাই তা-ও নেগ্রিটো জাতির লোকের অবদান। নেগ্রিটো জাতির লোকেরা বড় বড় বৃক্ষকে উর্বরতার প্রতীক হিসেবে পূজা করতো এবং মনে করতো যে, এ সকল বৃক্ষের ছায়াতেই বিদেহী আত্মার আবাসভূমি। ইন্দোনেশিয়া ও তার সন্নিহিত স্থানে প্রতিহিংসালিপ্সু দৈত্য কর্তৃক সংরক্ষিত মৃতের স্বর্গগমনের পথ সম্পর্কিত যে পৌরাণিক কাহিনী এখনো প্রচলিত আছে তা মূলত নেগ্রিটো জাতির লোকদেরই বিশ্বাসের ফল। তা ছাড়া মৎস্য, জন্তু, বৃক্ষ প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত টৌটেমের ধারণাও নেগ্রিটো জাতির লোকদের মাধ্যমেই এতদঞ্চলে প্রচারিত হয়।

অস্ট্রিক জাতি

নেগ্রিটো জাতির লোকদের মতো অস্ট্রিক জাতির লোকেরাও প্রধানত ভাগ্যান্বেষণেই ভারতবর্ষে এসেছিল। বৈদিক যুগের নিষাদ, ১৫০০ বৎসর আগের কোল ও ভিল্ল জাতি এবং শবর ও পুলিন্দরা হচ্ছে ভারতবর্ষে অস্ট্রিক জাতির প্রতিনিধি। এ জাতির লোকদের খনন-যষ্টির সাহায্যে এবং নিড়ানির সাহায্যে আদিম কৃষিকাজ জীবিকা নির্বাহের প্রধান পেশা ছিলো। এদের মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এ জাতির লোকেরা অপর ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারে নিষ্ক্রিয় থাকে। তবে বাইর থেকে কোনো আক্রমণ আসলে তারা তা প্রতিহত করার শক্তি রাখে। স্বভাবের দিক থেকে অনুসন্ধিৎসু না হলেও অপরের বক্তব্যের অর্থ অনুধাবন ও গ্রহণ করতে তারা সক্ষম। বিশ্বাস ও কল্পনাপ্রবণতা এদের মধ্যে খুবই বেশি বলে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। উৎসব, নৃত্য ও বিভিন্ন ধরনের কাজে এদের মধ্যে যুগচারিতাবৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাম্য ও ঐক্য হচ্ছে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

অস্ট্রিকদের জীবনচরিতের ওপর নির্ভর করেই ভারতবর্ষে জাতককাহিনী, পঞ্চরাত্র এবং হিতোপদেশ রচিত হয়। অস্ট্রিকদের মধ্যে প্রচলিত 'মানা'র ধারণা থেকে আধুনিক বিদ্বানরা ভারতীয় দর্শনের ব্রহ্মবাদ এসেছে বলে মনে করেন। পলিনেশীয় ও মাওরীদের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিবাদের অপূর্ব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, পলিনেশীয় অস্ট্রিকদের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের ব্রহ্মাণ্ডবাদ,

অবতারবাদ, সত্যবতীর কাহিনী এবং তিথি অনুযায়ী দিবা-রাত্রির হিসাব প্রভৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির ধারণার সাথেও ভারতীয় মতের মিল আমরা খুঁজে পাই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এ ধারণার সঙ্গেই হিন্দুধর্মে পরে নৈতিক ও দার্শনিক বিষয় সংযোজিত হয়।[৪]

মঙ্গোলীয় জাতি

আধুনিক বিদ্বানদের মতে অন্যান্য জাতির ন্যায় মঙ্গোলীয় জাতির লোকেরাও ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিলো। এ জাতির লোকেরা প্রধানত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, মধ্য ও পূর্ব নেপালে, উত্তর বিহারে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদের বিভিন্ন স্থানে এদের উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় এক হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে মঙ্গোলীয় জাতির বসতি স্থাপন সম্পন্ন হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েই এরা ভারতবর্ষে আসে।

স্বভাবের দিক থেকে মঙ্গোলীয় জাতির লোকেরা প্রবল আশাবাদী। মেজাজের দিক থেকে সবসময়ই তারা প্রফুল্ল থাকতে ভালোবাসে। ব্যবহারের দিক থেকে এ জাতির লোকেরা খুবই অমায়িক। এরা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। পরাধীনতা এদের একেবারেই অপছন্দনীয়। এরা সাশ্রয়ী, সাহসী এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। তবে এ জাতির লোকদের মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতির কোনো গভীরতা নেই। তাই এদের মধ্যে যুক্তিবাদী কোনো দার্শনিক মনোভাব গড়ে ওঠেনি। পোষাক-পরিচ্ছদ, ছন্দ ও বর্ণের ব্যাপারে এদের মধ্যে একটি সহজাত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চারুকলায় এরা নিষ্ঠাবান ছাত্রের ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু প্রথাগত পথ পরিত্যাগ করতে এরা অনভ্যস্ত।[৫]

দ্রাবিড় জাতি

যে জাতির দ্বারা প্রাচীন ভারতের নগরের পত্তন হয়েছিলো, বিদ্বানদের মতে তারাই হচ্ছে দ্রাবিড় জাতি। প্রচলিত অর্থে বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষা, বিশিষ্ট কোনো একটি

---

৪. S. K. Chatterjee.,'Contributions from Different Language Cultre Groups' in *The Cultural Heritage of India, Vol. 1*, Calcutta, 1966, পৃ. ৮০

৫. ঐ, পৃ. ৮৯

গোষ্ঠীর লোক, অথবা বিশিষ্ট কোনো একটি সভ্যতাকে বুঝাতে গিয়ে দ্রাবিড় শব্দটির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতীতে ভাষাগত ও জাতিগত পর্যবেক্ষণের ফলে উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ আর্য আর দক্ষিণ ভারতকে সম্পূর্ণ দ্রাবিড় বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় একথা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। জাতিগত সংমিশ্রণের ফলে আজ উত্তর ভারতের কিছু কিছু ভাষাতেও দ্রাবিড় ভাষা, আর দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু ভাষাতেও আর্য ভাষা পরিলক্ষিত হয়। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার যে সকল উপাদান ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো তাদেরকে নিম্নোক্ত শিরোনামে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা যায়।

অরণ্যের প্রভাব

ভারতীয় দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মধারায় অরণ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। যে সকল মনি-ঋষি ভারতীয় দর্শনের উপদেষ্টা বা নায়ক, তাঁদের অধিকাংশই অরণ্যে বাস করতেন। অন্তত পরম সত্যের সন্ধান পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতাই অরণ্যের নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন।[৬] অরণ্যে স্থাপিত আশ্রমগুলোই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার অন্যতম উৎসভূমি। কিন্তু উপনিষদ-পূর্ব বৈদিক সাহিত্যে আমরা অরণ্যের কোনো প্রভাব দেখতে পাই না। উপনিষদ-পূর্ব ঋকসংহিতার ঋষিদের সকলেই আরণ্যক আশ্রমে বসবাস করতেন না। সমাজের আরো দশজনের মতো তাঁদের সবাই গৃহে বাস করতেন। ধ্যান-অনুষ্ঠান করার জন্যও তাঁরা অরণ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। তবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঋষিদের নগর ও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র ধ্যানস্থ হওয়ার কথা পাওয়া যায়। সেই অন্যত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এ এমন এক নির্জন জায়গা, যেখানে নগর ও গ্রামের ছাদ পর্যন্ত দেখা যায় না। তাই ওই স্থানকে 'অ-চ্ছদি-দর্শ

---

৬. এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। মানবতার মুক্তির জন্য মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার এক আলোকসমুজ্জ্বল তিথিতে রাত্রির গভীর অন্ধকারে পরমাসুন্দরী ভার্যা যশোধরা, একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্র রাহুল, স্নেহশীল জনক-জননী, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং সুরম্য রাজপ্রাসাদের অকৃত্রিম সুখ পরিহার করে তিনি ধূলিধূসরিত পথে রাজমহল ত্যাগ করেন। তাঁর এ ত্যাগ সভ্যতার ইতিহাসে এক অতি বিরল ঘটনা। এ কারণে আজো সমগ্র ভারতবাসী তাঁকে নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য দেখুন, নীরু কুমার চাকমা, *বুদ্ধ : তাঁর ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা, ১৯৯০

আখ্যাত করা হতো।[৭] তবে মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণ ভাগেও আমরা অরণ্যের কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না। বেদে যে সকল দেবতার স্তুতি কীর্তন করা হয়, সে সকল দেবতা বৈদিক সমাজে সর্বপূজিত, তাঁদের কেউই কিন্তু আরণ্যক দেবতা নন। বৈদিক দেবতারা অশ্বচালিত পুষ্পরথে আরোহণ করে মানবসমাজে আসতেন এবং তাঁদের সাথে মৃগয়ারও কোনো অনিবার্য সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় না।[৮]

কিন্তু হিন্দুধর্মের অবৈদিক দেবতাদের সাথে অরণ্য এবং মৃগয়ার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অবৈদিক দেবতারা যে অরণ্যের আশ্রমে থাকতেন ধ্যান-অনুধ্যানের জন্য যে তাঁরা অরণ্যের নির্জন আশ্রমকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন আমরা তার প্রমাণ পাই। এতে অবৈদিক প্রভাবই প্রমাণিত হয়। হিন্দু ধর্মে যে সকল শৈব দেবতা আছেন তাঁদের সকলেই অরণ্যে বাস করা পছন্দ করতেন। একারণেই তাঁদেরকে প্রাক-বৈদিক দেবতা বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে দু'জন শৈব দেবতার নাম উল্লেখ করে তাঁদের জীবনে অরণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বুঝে নেয়া যেতে পারে। এ দু'জন শৈব দেবতা হচ্ছেন যথাক্রমে দুর্গা ও আয়াস্পান। দুর্গা হচ্ছেন দুর্গতি নিধনকারী, দুর্গতি বিনাশকারী দেবী। মানব জাতির সমুদয় দুঃখ-দুর্দশা বিনাশ করাই তাঁর অন্যতম কাজ। তিনি অবশ্য বৈদিক। কিন্তু আয়াস্পান বৈদিক দেবতা নন, তিনি হচ্ছেন দ্রাবিড়ীয়। তিনি সমুদ্র মন্থনের পর শিবের ঔরষে অমৃত পরিবেশনকারিণী মায়ারূপী বিষ্ণুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্গা ও আয়াস্পান দেবতার মন্দিরকে 'কাবু' বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। 'কাবু' শব্দটির আভিধানিক বা আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে অরণ্য বা কুঞ্জ। এ কারণেই অরণ্য বা কুঞ্জেই দুর্গা বা আয়াস্পানের পূজা করা হতো। অন্যদিকে সর্পদেবতা বা অনন্ত শীষনাগ বাসুকীর বিগ্রহ যে সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সে সকল স্থানও ওই অরণ্য বা কুঞ্জ নামে পরিচিত। এ থেকেই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে অরণ্যের প্রভাব অনুমান করা যায়।

---

৭. S. Radhakrishnan., *op. cit.*, পৃ. ৩২

৮. ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিতে প্রাক-বৈদিক সভ্যতার অবদান নির্ণয়ের বিষয়টি মূলত স্যার রাধাকৃষ্ণাণ সম্পাদিত History of Philosophy : Eastern and Western গ্রন্থের 'Pre-Vedic Elements in Indian Thought' শীর্ষক অধ্যায় অবলম্বনে রচিত।

মন্দির উপাসনা

মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এটিও ভারতীয় দর্শনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে এ বৈশিষ্ট্যটি যে কেবল ভারতীয় দর্শনকে প্রভাবিতই করেছিলো তা-ই নয়, বরং এটি একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে সত্যের সমস্যা সমাধানের প্রণালীতেও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো। বৈদিক সভ্যতা তৎকালে কেবলমাত্র যাগ-যজ্ঞের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যজ্ঞানুষ্ঠানে ঘৃত আহুতি দেয়াই সেকালে বৈদিক ঋষিদের একমাত্র প্রচলিত রীতি ছিলো। যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে ঈশ্বরোপলব্ধি তখন এক রকম অবোধ্য ছিলো বলেই মনে হয়। বেদগুলো তাই যজ্ঞানুষ্ঠানের যজ্ঞের প্রচারকেই তাদের একমাত্র ব্রত এবং সাধারণ মানুষের একমাত্র ধর্মীয় কাজ বলে প্রচার করতেন। বেদ তাই তখন একান্তভাবেই যজ্ঞ প্রধান ছিলো। সামাজিক জীবনটাও ছিলো স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠান সর্বস্ব। যজ্ঞের দার্শনিকতা বিচার বা তত্ত্বানুসন্ধান তখন একেবারেই ছিলো গৌণ। কিন্তু প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্যটি এ ধারণাকে পাল্টিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

প্রাক্-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের ফলে বোঝা গেলো সূক্ষ্ম তর্কবিচার ও দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার জন্য সর্বাগ্রে যা বেশি প্রয়োজন তাহলো একান্ত চিত্তে গভীরভাবে অনুধ্যান করা। একান্ত নিবিষ্ট মনে গভীরভাবে অনুধ্যানের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান অনুকূল নয়। এর জন্য প্রয়োজন মন্দিরে উপাসনা করা। মন্দিরেই কেবল দৈবশক্তির মূর্ত উপাসনায় ঈশ্বর ও বিশ্বজগতের স্বরূপ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবগত হওয়া সম্ভব। এভাবেই মন্দিরে উপাসনা করায় মানবচিন্তার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। অমূর্ত আকারে কোনো দৈব শক্তিকে উপাসনা করলে তার শক্তি ও ক্রিয়াপরতা সম্বন্ধে আমরা সঠিকভাবে অবহিত হতে পারি না। যে দেবতার যে প্রতীক বা যে বিগ্রহ যেখানে আছে, সেখানেই পূজারী সেই দেবতাকে একাগ্রচিত্তে উপাসনা করে তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মন্দিরের উপাসনার সাথে যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনা করা যেতে পারে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সার্বজনীন অনুষ্ঠান হিসেবে যাগ-যজ্ঞাদি বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট পর্বেই সম্ভব। অবশ্য গৃহেও যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি আছে। তবে তা সার্বজনীন নয়। আর এ কারণেই যাগ-যজ্ঞের পরিধিও খুব

ব্যাপক নয়। কিন্তু মন্দিরে ঐশ্বরিক উপাসনা বৎসরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট কোনো পর্বে সীমাবদ্ধ নয়। এ ধরনের উপাসনা স্থায়ী এবং সার্বজনীনভাবে রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। মন্দিরে কেবল যে গুটি কতক অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ঋষিরাই ভগবদোপলব্ধি করতে সক্ষম হন তা-ই নয়, সাধারণ মানুষও এ উপলব্ধির অধিকারী হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে যেহেতু কেবল অগ্নিই পরিদৃষ্ট হয় এবং সাধারণ মানুষ উপাসনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না, সে কারণে যজ্ঞানুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবদোপলব্ধি কেবল কষ্টকরই নয়, অসম্ভবও বটে। মন্দিরোপাসনায় যেহেতু নিত্য পূজার ব্যবস্থার বিধান করতে হয়, সবাইকে এক সাথে সম্মিলিত হতে হয় এবং দৈব শক্তির মূর্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেকারণে এ বিধানগুলোর কল্যাণে মননশীল চিন্তার ক্ষেত্র অনেকাংশে প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে এর আশা করা যায় না।

ঐতিহাসিক শাস্ত্রবিশারদদের মতে, আরণ্যক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই সেকালে মন্দিরসমূহের উৎপত্তি হয়েছিলো। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতিতে নিজ নিজ গৃহে, গ্রামে এবং নগরে উপাসনা করার বৈশিষ্ট্যটি মন্দিরোপাসনার সাথে সংযোজিত হওয়ার অবধারিত ফলশ্রুতিতেই গৃহে, গ্রামে এবং নগরে মন্দিরগুলো গড়ে উঠেছিলো। মন্দিরের সাথে অরণ্যের যে একটা সম্পর্ক আছে তার প্রমাণ আমরা অনাচ্ছাদিত বিগ্রহ থেকে পাই। এখনও এমন অনেক মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে বিগ্রহগুলোর ওপর কোনো ছাদ নেই। বৃষ্টি-বাদল আর রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্যে বিগ্রহগুলোকে সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা হয়। এসবই প্রাক-বৈদিক সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল। প্রাক-বৈদিক সভ্যতার এ ফল ভারতীয় দর্শনের বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

মানবেতর প্রাণিত্বে মর্যাদা প্রদান

পশু-পাখি, গাছ-পালা প্রভৃতি মানবেতর প্রাণী ও জড়বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার আরো একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এগুলোও ভারতীয় চিন্তাধারা, দর্শনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পশু-পাখি ও গাছ-পালা আরণ্য সভ্যতায়ই কেবল বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু প্রাক-বৈদিক সভ্যতা ছিলো আরণ্যিক সভ্যতা সেকারণে তার সাথেই কেবল মানবেতর প্রাণী ও জড়বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব। অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা অরণ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিলো

বলেই তার সাথে মানবেতর প্রাণী ও জড়বস্তুর সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যের কোথাও কোথাও কোনো কোনো পশু-পাখির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন দেবতাদের রথ বহন করার জন্য অশ্ব ও দুগ্ধদাত্রী গাভীর কিছু উল্লেখ বেদের কোনো কোনো অংশে পাওয়া যায়। অশ্ব এবং গাভী ছাড়াও বেদে মৎস্যসহ আরো কিছু প্রাণীরও উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঠের উল্লেখও বেদে আছে। তবে এ ধরনের উল্লেখ কেবল আপতিক, অনিবার্য নয় কোনো মতেই। এ ধরনের উল্লেখের মাধ্যমে পশু-পাখি ও জড়বস্তুর ওপর কোনো গুরুত্ব প্রদর্শিত হয়নি, প্রাসঙ্গিকভাবে তাদের আলোচনা হয়েছে মাত্র। প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতিতেই মানবেতর প্রাণী, জীবজন্তু ও জড়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে জীবজন্তু ও গাছপালার স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাই একথা অবশ্যই স্মর্তব্য যে, জীবজন্তু ও গাছপালার ওপর গুরুত্বারোপ বৈদিক সভ্যতার ওপর প্রাক-বৈদিক সভ্যতারই অপরোক্ষ ফল।

বৈদিক সভ্যতার ওপর প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার এ প্রভাবের ফলেই উত্তরকালে ভারতীয় সংস্কৃতি এক নবরূপ পরিগ্রহ করে। এর প্রভাবেই উত্তরকালে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গো-উপাসানা একটি প্রধান অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতিতে গো-উপাসনার কোনো উল্লেখ নেই। তাই এটা প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল। প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার ফলে পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি ও জীবজন্তুকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন হিসেবে এবং তাদের ধ্বজা প্রতীক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, শিবের বাহন হিসেবে বৃষকে, বিষ্ণুর বাহন হিসেবে গরুড়কে এবং ব্রহ্মার বাহন হিসেবে হংসকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা জানি হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ থাকলেও এ ধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী। এই এক ঈশ্বরই হিন্দুধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই ত্রিধারায় বিকশিত।[৯] হংস, গরুড় ও বৃষ এ তিনটি পশু তাই উত্তরকালের হিন্দুধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া যে অনন্ত শীষনাগ বাসুকি পৃথিবীকে বহন করে চলেছে তার কুণ্ডলীকৃত দেহের ওপরই স্বয়ং বিষ্ণু শায়িত আছেন এবং এই স্বয়ং বাসুকিই আবার মহাদেব শিবের অলঙ্কার হিসেবে অবস্থান করে তাঁর শোভা বর্ধন করে চলেছে। এভাবে উত্তরকালের হিন্দুধর্মে হংস, গরুড়, বৃষ,

---

৯. একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য-
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহু :।। **ঋগবেদ সংহিতা** – ১।১৬৪।৪৬

সর্প প্রভৃতির মতো বাঘ, হাতি, সিংহ, মহিষ, প্রভৃতি বিভিন্ন পশু বিভিন্ন দেবদেবীর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। দেবদেবীকে পূজা করার সাথে সাথে মানুষ তাদের বাহনরূপী বিভিন্ন পশু-পাখি এবং জীবজন্তুকেও পূজা করতে থাকে। শুধু পশু-পাখি এবং জীবজন্তুই দেবদেবীর সাথে যুক্ত হয়ে পূজার পাত্র হয়নি, কালক্রমে বড় বড় বৃক্ষ, বিশেষত বটবৃক্ষও পূজ্য হয়ে উঠলো। ফলে দৈব শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র বড় হতে লাগলো এবং বড় বড় নদ-নদী এবং সমুদ্র তীরবর্তী স্থান হিন্দুদের পুণ্যভূমিতে পরিণতি লাভ করলো। এসবই প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার ফল।

দেবীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

দেবতাদের সাথে সাথে তাঁদের ভার্যা হিসেবে দেবীদের প্রতি সমান গুরুত্ব-প্রদান প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বৈদিক-সাহিত্য হিন্দু-সংস্কৃতির প্রধান উৎস। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যের পটভূমির আলোকে তার মধ্যে একটি ঐক্যের কলতান বৈদিক সাহিত্যের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এর কোনো সামগ্রিক বা সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা তার মধ্যে লক্ষ্য করি না। ঐশ্বরিক শক্তিসমূহকে পুরুষ হিসেবে উপাসনা করতে করতে বৈদিক সাহিত্যের এ দিকটি, দার্শনিক বা সামগ্রিকতার দিকটি একেবারেই ভুলে যায়। ঐশ্বরিক শক্তিরও যে স্ত্রীরূপ থাকতে পারে, এ দিকের প্রতি বৈদিক সাহিত্য খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। এতে করে উপাসনা পদ্ধতিটিও অনেকটা আংশিকতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। এ দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাই প্রথম। প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলেই পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যে দেবতাদের স্ত্রী হিসেবে দেবীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান শুরু হয়। অবশ্য প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার আগে বেদে যে কোনো দেবীর কথাই উল্লেখ নেই, তা ঠিক নয়। তবে স্মর্তব্য যে, যে কয়েকটি দেবীর কথা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার আগে দেখা যায় তাদের গুরুত্ব কিন্তু খুব বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। ধারাবাহিকতা রক্ষা করার খাতিরে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমেই সেকালে বৈদিক সাহিত্যে দেবীদের উল্লেখ করা হতো।

উদাহরণ হিসেবে এখানে অদিতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর সাথে অভিন্ন হিসেবে যিনি কল্পিতা তিনিই হচ্ছেন অদিতি। তাঁকে দেবতাদের জননী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আর এ কারণেই দেবতাদের মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে, বৈদিক যুগে অগ্নি,

ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের মতো তিনি সেইরূপে পূজিতা ছিলেন না। বৈদিক দেবীদের মধ্যে সরস্বতীর স্থান খুবই কম। সরস্বতীর মতো ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানীর গুরুত্ব বৈদিক ধর্মে সেকালে স্বীকৃত ছিলো না। দ্রাবিড়ীয় প্রাক–বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবেই উত্তরকালে বৈদিক ধর্মে দেবীদের মর্যাদা স্বীকৃত হয়। কারো কারো মতে প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় দেবদেবীদের প্রভাবের ফলেই বৈদিক ধর্মে মাতৃদেবতার আবির্ভাব ও পুন:প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। দেবীরা হলেন সকল সৃষ্টিশীল শক্তির আধার, আর এভাবেই দেবীরা সকল দেবতার অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে সক্ষম হলেন। এভাবেই আমরা ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভূমিকে দেখি বিষ্ণুর পত্নীরূপে এবং বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে দেখি ব্রহ্মার পত্নীরূপে। যে দেবীরা এককালে স্বীকৃত ছিলেন না, প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবে সেই অস্বীকৃত দেবীরাই উত্তরকালে দেবতাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। সুতরাং দেবীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং ঐ বৈশিষ্ট্যটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো।

মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন রচনা পাঠ করলে আমরা জানতে পারি যে, সেকালে ঈশ্বরের ত্রিরূপের মধ্যে ব্রহ্মাই শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবে এই দেবতাও স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেননি। পুরুষ–দেবতার মধ্যে যদিও বিষ্ণু এবং শিব উভয়ই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তবু উভয়ের মধ্যে কেবল শিবের পত্নী পার্বতীকেই প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। কালী এবং দুর্গা তাঁরই দুটি অবিচ্ছেদ্য রূপ। এ দুটি রূপও পরবর্তী কালে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে আজকাল ভারতবর্ষে এমন অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়, যারা মাতৃদেবতাকেই ভগবদশক্তির একমাত্র আধার বলে মনে করে থাকে। এ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শিবকে কেবল পার্বতীর স্বামী হিসেবেই পূজা করে থাকেন। শিবকে কোনো কোনো সম্প্রদায় তাই অর্ধ–নারীশ্বর বলেও পূজা করে থাকেন। পার্বতী ছাড়া মহাবিদ্যা ও যোগিনী নামে আরো দু'জন দেবীও শিবের সঙ্গিনী ছিলো। এ দু'জন দেবীর সঙ্গী হিসেবেও অনেকে শিবের পূজা করে থাকেন। এভাবেই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাকে মাতৃপূজায় প্রভাবিত করেছিলো।

ঈশ্বরের সৃষ্টত্ব

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি খুব একটা ছিলো বলে মনে হয় না। সেকালে দেবতারা স্পষ্ট আকারও ধারণ করতে পারেননি। অর্থাৎ দেবতারা তাঁদের অসীম ক্ষমতার মূর্তরূপ নিয়ে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু প্রাক–বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে হিন্দু চিন্তাধারায় ঈশ্বরের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলেই দেবদেবীদের ওপর নানাবিধ কার্য ও শক্তি নির্দিষ্ট হয়। জগৎ সৃষ্টির দায়িত্ব ব্রহ্মার ওপর অর্পিত হলেও জগৎ স্রষ্টার ধারণাটি তখন খুবই অস্পষ্ট ছিলো। যার ফলে ধর্মীয় ইতিহাসে এর প্রভাব ও গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গিয়েছিলো। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার কাহিনী তখন কেবল পৌরাণিক কাহিনীতে স্থান পায়। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে ব্রহ্মার ধারণাও গণমানুষের মানসপটে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠলো। লক্ষ্মী ও ভূমিকে নিয়ে অনন্ত শীষনাগ বাসুকীর কুণ্ডলীকৃত দেহে শায়িত জগৎপালক বিষ্ণুর যে বিগ্রহ বৈদিক সভ্যতায় দেখা যায় তাতেও দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। পার্বতী ও পুত্র–অনুচরসহ কৈলাস পর্বতে অবস্থিত যে শিব উন্নত জগৎ সৃষ্টির জন্য জগতের সংহার কার্যে নিয়োজিত আছেন তাঁর বেলায়ও ওই একই কথা সমানার্থে প্রযোজ্য। এভাবেই গণেশ ও স্কন্দসহ আরো অনেক দেবতা বিশিষ্ট ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে নির্দিষ্ট কাজের অধিকারী হলেন।

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবে দেবতাদের ব্যক্তিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় চিন্তাধারায় ভক্তিবাদের পথও সুগম হয়ে যায়। বৈদিক সাহিত্যে যদিও কোনো কোনো দেবতার স্তোত্রে ভক্তিযোগের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়, তবু এর পরিপূর্ণ বিকাশ তাতে লক্ষ্য করা যায় না। বৈদিক সভ্যতার ওপর দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলে মানুষের মনে ঈশ্বরের ধারণার পরিবর্তন হওয়ায় বৈদিক সাহিত্য থেকে নতুন একটি সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়, যা মন্দিরোপাসনা সম্পর্কিত আগমশাস্ত্র নামে সমধিক পরিচিত। অনুরূপভাবে তামিল ভাষায় শৈব সম্প্রদায়ের **'আলোয়ার'** নামে পরিচিত সন্তদের ভক্তিমূলক সঙ্গীত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব মতাবলম্বীদেরও *'দিব্য প্রবন্ধ'* নামে অনুরূপ আরেকটি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ সবই প্রাক–বৈদিক সভ্যতার অপরোক্ষ ফল।

দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের ফলেই বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বৈদিক অনুষ্ঠান পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ এবং দার্শনিক চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ উপনিষদ

সাহিত্যের যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির যথেষ্ট বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কুমারিল ভট্ট থেকে শংকরাচার্য পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ভারতবর্ষে মীমাংসা ও বেদান্তের সূত্রাবলির সাথে সাথে মহাভারতের অঙ্গ হিসেবে শ্রীমদ্ভগবদগীতাসহ বিভিন্ন মহাকাব্যের সৃষ্টি এবং তামিল ভাষায় বিভিন্ন উপাসনা সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। এগুলোই বৈদিক ধর্মের নবজাগরণেরও পথ সুগম করে দেয়। ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক ধর্মের এ নবজাগরণ বা পুনরুজ্জীবন চারটি প্রধান দ্রাবিড় ভাষাভাষী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিলো। ভারতীয় দর্শনের এ চারজন যুগপুরুষ হলেন, কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, স্বামী রামানুজ এবং মাধবাচার্য। কুমারিল ভট্ট ছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের, শংকরাচার্য কেরালার, স্বামী রামানুজ তামিল দেশের এবং মাধবাচার্য ছিলেন কর্ণাটকের। বৈদিক ধর্মের নামে এ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করলেও এঁরা যে সবাই দ্রাবিড়ীয় ছিলেন তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আবার দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবে মন্দিরোপাসনার যাবতীয় সৃষ্ট সাহিত্য বেদের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়ার ফলে তা বৌদক সাহিত্যেরই একটি অনিবার্য অঙ্গ হিসেবে পরিণতি লাভ করলো। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ উপনিষদ ও গীতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরতত্ত্বের যে বিবরণ দেখা যায় তা অবশ্যই বৈদিক নয়। অনুরূপভাবে স্বামী রামানুজ এবং মাধবাচার্য তাঁদের দর্শনের মূল প্রেরণা বেদ থেকে লাভ করলেও তাঁদের দার্শনিক কর্মকাণ্ড কিন্তু মন্দিরোপাসনা ও আগম শাস্ত্রের ওরপই ছিলো প্রতিষ্ঠিত। এভাবেই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ

মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাকে পূজা করা প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যটি বেদোত্তর সভ্যতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। এর ফলে মহাপুরুষদের দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হতো এবং মনে করা হতো যে, মহাপুরুষরা মানবজাতিকে সঙ্কটময় মুহূর্ত থেকে রক্ষা করার জন্যই ধূলিময় পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে অবতীর্ণ হন। তাঁদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ধর্মকে তার পূর্বাসনে বসিয়ে দুষ্টদের দমন করা, আর পুণ্যাত্মাদের সামাজিক মর্যাদা

নিশ্চিত করা।[১০] উত্তরকালে ভারতবর্ষে এ সকল মহাপুরুষের জন্যও গ্রামে-নগরে মন্দির নির্মিত হয় এবং কালক্রমে দেবতারূপে তাঁদের অর্চনা করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণতি লাভ করে। রাজপুতনার কর্ণীজী দেবী এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আমাদের মতোই রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেবীজ্ঞানে অর্চনা করা কিছুদিন আগ পর্যন্তও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলো।

অবশ্য দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার প্রভাবের পূর্বেও বেদে এ ধরনের আংশিক আভাস লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্যে মরূৎ এবং ঋভুদের ন্যায় কোনো কোনো মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে সেকালেও তাঁরা পূজিত হতেন। অনুরূপভাবে অঙ্গিরসের মতো কোনো কোনো মানুষকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন এবং ঐশ্বরিক শক্তির ক্ষমতায় বসিয়ে পূজা করা হতো। তবে বৈদিক সাহিত্যে আমরা এমন কোনো দেবতার উল্লেখ পাই না, যিনি আমাদের মতোই মানুষ হিসেবে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রাক-বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে হিন্দুধর্মে ঈশ্বরও যে পশুরূপ ধারণ করে মর্ত্যে আসতে পারেন তা-ও স্বীকৃত হয়েছে। যেমন, কপি-দেবতা হনুমান আর হস্তী-মানবদেবতা গণেশ। এঁরা দুজনেই পশুর আকার ধারণ করে ধরাতলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে শিবের অনুচর নন্দী এসেছিলেন বৃষরূপে এবং স্কন্দ বা সুব্রহ্মণ্য এসেছিলেন সর্পের আকার ধারণ করে। এগুলো প্রাক-বৈদিক প্রভাবেরই ফল।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

এখন আমরা সিন্ধু নদের উপত্যকার সভ্যতা ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিলো কিনা, এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার সাথে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পার্থক্য আছে কিনা, এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলতে না পারলেও উভয়ের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তা অনেকটা

---

১০. যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
আভুত্থানম্ অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। **গীতা** -৪ ঃ ৭ ও ৮

সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মতো সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতারও এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

এক. লিঙ্গপূজা :, লিঙ্গপূজা সিন্ধু উপত্যকার লোকদের সেকালের ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের বিকাশে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষ লিঙ্গকে ঐশ্বরিক শক্তির সৃজনী ক্ষমতার উৎস বলে মনে করতো। বৈদিক সাহিত্যে এ ধারা খুবই ক্ষীণ। বেদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তির কোনো স্পষ্ট বিবরণ বেদে পাওয়া যায় না।

দুই. মাতৃপূজা :, মাতৃপূজা সিন্ধু সভ্যতার লোকদের ধর্মের আরো একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিন্ধু উপত্যকায় মাতৃদেবতার এমন অনেক মূর্তি পেয়েছেন, যা থেকে সেকালের লোক যে মাতৃদেবতার পূজায় অধিকমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন তা বোঝা যায়। এ বৈশিষ্ট্যটি আমরা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাতেও দেখেছি। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মতো এটিও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিলো।

তিন. মন্দিরোপাসনা : , প্রাক-বৈদিক দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মতো সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতাতেও মন্দিরোপাসনা একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। সিন্ধু সভ্যতা যেহেতু প্রধানত নগর সভ্যতা, সেহেতু নগরে নগরে মন্দির স্থাপিত হয়েছিলো। মন্দিরে উপাসনা করাই সেকালে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হিসেবে স্বীকৃত ছিলো।

চার. মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি :, মৃতদেহকে মাটির নিচে সৎকার করা সিন্ধু সভ্যতার লোকদের প্রচলিত ধর্মের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিন্ধু উপত্যকায় অনেক সমাধিপাত্র আবিষ্কার করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর মৃতদেহ সমাহিত করা হতো, দাহ করা হতো না। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রাক-বৈদিক হলেও ভারতবর্ষের কোনো কোনো স্থানে আজো প্রয়াত সন্ন্যাসীদের দাহ না করে সমাহিত করা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে এটা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার অপরোক্ষ ফল।

পাঁচ. কর্মবাদ :, কর্মের ওপর গুরুত্বারোপ সিন্ধু সভ্যতার প্রচলিত ধর্মের আরো একটি বৈশিষ্ট্য। বৈদিক সভ্যতার আদি পর্বে— কর্মবাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবের ফলেই উত্তরকালে ভারতীয় দর্শন ও

সংস্কৃতিতে কর্মবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। এই কর্মবাদের ওপর বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিকদের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী করে তুলেছে।

বৈদিক সভ্যতা

বৈদিক সভ্যতা–সংস্কৃতির ইতিহাস খুবই বিশাল। বিদ্বানদের মতে আর্যরাই সর্বপ্রথম এ দেশে বেদ প্রচার করেন, যদিও এই আর্যরা কবে, কোথা থেকে এবং ঠিক কখন ভারতবর্ষে এসেছিলো তার নিশ্চিত কোনো ইতিহাস এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। আর্য প্রচারিত এই বৈদিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়েই সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য পাঠ করলে আমরা বৈদিক যুগের ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত হতে পারি। কোন কোন গবেষকদের মতে স্কান্দিনেভিয়া, অস্ট্রিয়া, চেক, শোভাকিয়া, রাশিয়া, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া এবং আরমেনিয়া প্রভৃতি স্থান ছিলো আর্যদের আদি আবাস। প্রাচীন কালের কোনো এক সময়ে আর্যরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পারস্য দেশে আগমন করে, এবং সেখান থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে আগমন করে ; আর এ ভাবেই এখানে বৈদিক সংস্কৃতির গোড়া পত্তন ঘটে।[১১] এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বেদ

বেদ ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে বেদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উইন্টারনিজের মতে যার দ্বারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও পরমজ্ঞান সমন্বিত কোনো গ্রন্থকে বোঝায়, যে গ্রন্থের ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যা কিনা অবিসংবাদিত ও অনিবার্যরূপে সত্য তাই বেদ।[১২] কেউ কেউ আবার বেদ বলতে ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্যকে বুঝে থাকেন। কিন্তু এই সাহিত্য অর্থেও বেদ বলতে নির্দিষ্ট কোনো একটি

---

১১. সুনীলকুমার দাস, ***পূর্বোক্ত***, পৃ. ১৬

১২. M. Winternitz., *History of Indian Literature, Vol. 1*, University of Calcutta, 1959, পৃ. ৫২

গ্রন্থবিশেষকে বোঝায় না – প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টিকে বোঝায়।[১৩] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় তাকে বলে বেদ।[১৪] বেদ বিশেষজ্ঞ সায়নাচার্যের মতে, যে গ্রন্থ পাঠে আমরা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি তাই বেদ।[১৫] কেউ কেউ আবার বেদ বলতে বোঝেন এমন শাশ্বত সত্যকে , যা ঋষিদের অন্তরে পরম পুরুষ ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে। এঁরা বেদকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলে মনে করেন। এঁরা মনে করেন যুগান্তে বেদ অপ্রকাশিতভাবে থাকে, যুগারম্ভে ঋষিরা পুনরায় তপস্যার মাধ্যমে বেদকে লাভ করেন।[১৬]

অনেকে বেদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেদকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। বেদের ব্যুৎপত্তিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংস্কৃত 'বিদ্' শব্দ থেকে বেদ শব্দটির উৎপত্তি। 'বিদ্' শব্দের অর্থ 'জানা' তথা জ্ঞান বা বিদ্যা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক ও মন নামক ষড়েন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করতে পারি না। বেদ হচ্ছে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের ধারক ও বাহক। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, সব কিছুই এর প্রতিপাদ্য। ধর্ম, যজ্ঞ, সর্গ, পরলোকতত্ত্ব, অদৃষ্টসহ যাবতীয় জ্ঞান এবং ব্রহ্মা ও মোক্ষ প্রভৃতির জ্ঞান বেদাধ্যয়নে জানা যায়। বৈদিক আচার্যরা একারণেই বেদকে ধর্মতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্বের সোপান আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। মনুসংহিতায়ও বেদকে অখিল ধর্মের প্রাণস্পন্দন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[১৭] তাই বেদাশ্রয়ীদের মধ্যে তা এক মহা মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ। বেদ প্রচারের পূর্বে বেদাশ্রয়ীদের মধ্যে অন্য কোনো শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের বিকাশ হয়েছে বলে ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। আর একারণেই ভারতীয় আর্যসভ্যতার

---

১৩. M. Bloomfield., *Religion of the Veda*, Edinburgh, 1957, পৃ. ১০৭

১৪. প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।।

১৫. ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োর লৌকিকসু পায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, *কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকা।*

১৬. যুগান্তে অন্তর্হিতানব বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয় ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা ।। **মহাভারত শান্তিপর্ব**- ২১০ : ১৯

১৭. বেদ ঃ অখিলধর্মমূলম্। **মনুসংহিতা**- ২।৬

মূলভিত্তি হিসেবে বেদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি ও রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারততত্ত্ববিদরা বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা সত্ত্বেও বেদের উৎপত্তি ও কাল নির্ণয়ের প্রসঙ্গটি এখনো তাঁদের কাছে অমীমাংসিত রয়ে গেছে।[১৮] প্রথমে জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলারের নাম করতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি ও কাল নির্ণয় করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের কালকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশের রচনা ও সংকলন সম্পূর্ণ হয়।[১৯] বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তির কাল সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের এ মত উত্তরকালে বালগঙ্গাধর তিলক বিরোধিতা করে স্বতন্ত্রভাবে বেদের উৎপত্তি কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বৈদিক সাহিত্যকে ম্যাক্সমূলার নির্ধারিত কালসীমা থেকে আরো প্রাচীন বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, বৈদিক সাহিত্যে আমরা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য দেখতে পাই। বৈদিক সাহিত্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধান প্রসঙ্গে বেশ কতকগুলো নক্ষত্রের উল্লেখ রয়েছে। বালগঙ্গাধর তিলক বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক ও নৈসর্গিক তত্ত্বের সাহায্যে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ থেকে ২৫০০ অব্দের মধ্যে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। এই হিসেবে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে বৈদিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঋকবেদ অংশের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করেন।[২০] বালগঙ্গাধর তিলকের মতো জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এইচ. জ্যাকবিও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দকে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি কাল বলে মনে করেন।[২১] অবশ্য প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ প্রফেসর থিবো তিলক ও জ্যাকবির মতের জ্যোতিষিক গণনাকে অস্থির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সমালোচনা করেছেন।[২২]

---

১৮. V. Brodov, *Indian Philosophy in Modern Times,* Progress Publisher, Moscow, 1984, পৃ. ৩০

১৯. F. MaxMuller, *A History of Ancient Sanskrit Literature,* Allahabad,1926, পৃ. ১০

২০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন, আদি পর্ব,* কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১২৯

২১. H. Jacobi, *Indian Antiquary, Vol. XLVII.,*পৃ. ১০২

২২. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা,* কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৭

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মতে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি।[২৩] অন্যদিকে প্রফেসর ম্যাকডোনেল পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার সঙ্গে ঋকবেদের ভাষাগত সাযুজ্যের ওপর নির্ভর করে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি বলে মনে করেন। হার্টেল আবার একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও বৈদিক সাহিত্যের সংকলন সম্পূর্ণ হয়নি।[২৪] সাম্প্রতিককালে মাদ্রাজের শ্রীকামেশ্বর আয়ার তিলক ও জ্যাকবির মতো নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের ভিত্তিতে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি কাল বলে নির্ণয় করেছেন। অবিনাশচন্দ্র দাস ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে অতি প্রাচীনকালে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, দুটি স্তরে ঋক্‌বেদের রচনা ও সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়, আর এই দুই স্তরের রচনার মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরেরও ব্যবধান ছিলো। সবদিক বিবেচনা করে তিনি বেদের প্রাচীন অংশ খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০০ অব্দে সংকলিত হয়েছিলো বলে মনে করেন। অবশ্য আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা অধ্যাপক দাসের এ মতকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০০ অব্দে পৃথিবীতে মানবজাতির কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। তাই ওই সময়ে বেদ রচনা বা সংকলনের প্রশ্নটাই অবান্তর।[২৫] হ্যাগ নামে অপর একজন দার্শনিক খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে বেদ রচিত ও সংকলিত হয়েছে বলে মনে করেন।[২৬]

বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তিকাল সম্পর্কিত উপর্যুক্ত মতের কোনটিকেই জার্মান পণ্ডিত এম. উইন্টারনিজ সমর্থন করেননি। তাঁর মতে পণ্ডিতরা বেদ-বহির্ভূত যেসব সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন সেসবের কোনোটিকেই সাক্ষ্য হিসেবে সঠিক বলা যায় না। তাই ভারতীয় সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেই আমাদের বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তি কাল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। এ দিক বিবেচনা করলে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ২০০০ অব্দকে বৈদিক সাহিত্য রচনার প্রারম্ভিক কাল এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০ থেকে ৫০০

---

২৩. S. Radhakrishnan., *op. cit,* পৃ. ৫৬

২৪. M. Winternitz., *op. cit,* পৃ. ৩০৭

২৫. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৮

২৬. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন,* তৃতীয় খণ্ড, বেদ ও উপনিষদ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫

অব্দকে অন্তকাল বলে অভিহিত করা যায়।[২৭] আবার কেউ কেউ মহাভারত ও পৌরাণিক ইতিহাসে বিধৃত ঘটনাবলি থেকে বৈদিক সাহিত্যের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, পৌরাণিক ইতিহাস অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই ব্যাসদেব বেদের বিভাগের কাজ সম্পন্ন করেন। আধুনিক বিদ্বানরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর ঘটনা বলে মনে করেন। এই হিসেবে তাঁরা খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যের সংকলন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করেন।[২৮]

বেদ মূলত কয়টি, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আদিকালে বেদকে ঋক, সাম এবং যজু:— এই তিন ভাগে ভাগ করা হতো। এ কারণেই কেউ কেউ বেদকে 'ত্রয়ীবিদ্যা' বলে আখ্যাত করে থাকেন। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে মন্ত্র যখন ছন্দে আবদ্ধ হয় তখন তাকে ঋক, যখন গীতে আবদ্ধ হয় তখন সাম, আর অবশিষ্ট মন্ত্রগুলোকে যজু: বলে। মোটের ওপর বলা চলে ঋক পদ্য, সাম গীত এবং যজু: গদ্য। শতপথ ব্রাহ্মণেও ত্রয়ীবেদের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বকর্মা হিরণ্যগর্ভ যখন ব্রাহ্মযজ্ঞাদি সম্পাদন করলেন তখন তাঁর বিশ্ব সৃষ্টিকে ধরে রাখার নিমিত্তে তেজ: (আগুন) থেকে ঋক, পবন (বায়ু) থেকে যজু: এবং দিবাকর (সূর্য) থেকে সামবেদ প্রকাশ করেন। এ কারণেই বেদাশ্রয়ীরা আগুনকে ঋকবেদের, বায়ুকে যজুর্বেদের এবং সূর্যকে সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে সম্মান করে থাকেন।

বেদের এই আদি বিভাগে অথর্ববেদের কোনো স্থান নেই। এ বিভাগ থেকে বিদ্বৎ সমাজে এরূপ ধারণা হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, বৈদিক সাহিত্যে বোধ হয় অথর্ববেদ স্বীকৃত নয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মন্ত্রের প্রকারভেদ অনুসারে বেদ তিন প্রকারের হলেও সংহিতা হিসেবে অথর্ববেদকে অস্বীকার করা যায় না। অথর্ব বেদ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না বলে এর বেদত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অথর্ববেদ ঋকবেদের পরিপূরক। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋক, সাম, যজু: ও অথর্ব নামে এই চার ভাগে বেদের শ্রেণীবিন্যাস করেন।[২৯]

---

২৭. M. Winternitz., *op. cit*, পৃ. ৩১০

২৮. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮–৯

২৯. আধুনিক বিদ্বানদের মতে এ কারণেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে পরিচিত। কথিত আছে, বেদকে এই চতুর্ভাগে বিভক্ত করে তিনি চার শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন,

সংহিতা :, প্রতিটি বেদ আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, আর উপনিষদ, এই চার ভাগে বিভক্ত। প্রথমেই ধরা যাক সংহিতা বা মন্ত্রের কথা। নিরুক্তে উক্ত আছে 'মন্ত্র মননাৎ', অর্থাৎ মনন থেকেই মন্ত্র বা সংহিতা শব্দটির উৎপত্তি। যার দ্বারা মনন করা হয় তাই মন্ত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রই বেদের·মূল কাঠামো। একারণেই ভাষ্যকাররা প্রথম থেকে মন্ত্রগুলোকে সংহিতাকারে বিধিবদ্ধ করার প্রয়াস পান। মন্ত্রের মধ্যে ভাবের একটা বাহনরূপী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বলে তার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে, যার ফলে বহু যুগব্যাপী তা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। মন্ত্রগুলো বিভিন্ন ঋষি দ্বারা দৃষ্ট। বেদাশ্রয়ীদের বিশ্বাস ঋষিরা মন্ত্র বা সংহিতার কোনো কর্তা নন। সংহিতা নিত্য বা অপৌরুষেয়।

বেদ চারটি বলে সংহিতাও চারটি। যেমন, ঋকবেদ–সংহিতা, সামবেদ–সংহিতা, যজুর্বেদ–সংহিতা এবং অথর্ববেদ–সংহিতা। বৈদিক যাগ–যজ্ঞাদি সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই সংহিতাগুলোর সৃষ্টি হয়েছিলো। বৈদিক যাগ–যজ্ঞাদির সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য বৈদিক সংস্কৃতিতে হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা নামে এ চারজন পুরোহিতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। দেবতারা যাতে যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে কারণে প্রশংসাসূচক স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে তাঁদের আহবান করাই হতো পুরোহিতের কাজ। দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য মধুর সুরে স্তোত্রগুলোকে নিয়ে গান করা হচ্ছে উদগাতা পুরোহিতের কাজ। আর ব্রহ্মার কাজ হচ্ছে যাগযজ্ঞের সার্বিক দায়িত্ব পালন করা। এই চারজন পুরোহিতের প্রয়োজন সাধনের জন্যই চারটি সংহিতার সৃষ্টি হয়েছে। হোতার জন্য ঋক, উদগাতার জন্য সাম, অধ্বর্যুর জন্য যজু এবং ব্রহ্মার জন্য অথর্ব।

সংহিতাগুলোর মধ্যে তাৎপর্যের বিচারে ঋক–সংহিতাই সবচেয়ে প্রাচীন। অন্যান্য সূত্রগুলোতে ঋক–সংহিতার অনেক সুত্র পাওয়া যায়। ঋক সংহিতা মোট ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০,৫৫২টি ঋকের সমষ্টি। সুক্ত মানে সু+উক্ত, অর্থাৎ শোভন বচন বা প্রশাস্তি। সকল সংহিতায় এ সূক্তগুলোকে মোট ১০টি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। মণ্ডলের উপরিভাগের নাম অনুবাক ; শাকল সংহিতায় অনুবাকের সংখ্যা ধরা হয়েছে ৮৫টি। প্রতিটি অনুবাক আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত।

জৈমিনি এবং সুমন্তকে যথাক্রমে ঋক, যজু:, সাম এবং অথর্ব বেদ পড়িয়ে তাঁদের ওপর বেদ প্রচারের ভার দেন। **মহাভারত**– ১২ ঃ ৩২৭ ঃ ৩৩–৫২

ঋষিরা যজ্ঞের আদর্শকে সামনে রেখে স্বীয় ভাবের আবেশে দেবতাদের প্রতি যে প্রশস্তি বন্দনা করেছেন ঋক-সংহিতায় তাই সঙ্কলিত হয়েছে। এখানে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ বলে উল্লেখ করা হলেও ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোমকেই তিনটি প্রধান দেবতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণেই ঋক-সংহিতায় এই ত্রিদেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্রের সংখ্যা সর্বাধিক। ইন্দ্র হলেন নীলাকাশের দেবতা। জল এবং মেঘ থেকে তাঁর জন্ম। তিনি বজ্রকে চালিত করেন এবং অন্ধকার দূরীভূত করেন। তাঁর পত্নীর নাম ইন্দ্রানী। মর্যাদার দিক দিয়ে ইন্দ্রের পরই অগ্নির স্থান। ঋক-সংহিতার প্রায় দু'শতাধিক মন্ত্রে অগ্নি দেবতার স্তুতি কীর্তন করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে তিনি নিকটতম। তিনি কেবল ধরাধামে বা চুল্লীতে কিংবা বেদীতেই নন, আকাশে ও সূর্যে, উষায় ও মেঘেও তিনি বিদ্যুৎরূপে বিরাজমান। তাঁকে দেবতা ও মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সোম হলেন প্রেরণার দেবতা, অমর জীবনের দাতা এবং দ্রাক্ষার দেবতা। তিনি অন্ধকে দেখতে এবং মানুষকে চলতে সাহায্য করেন।

ঋক-সংহিতার পর আসে সাম-সংহিতা। বেদ সংহিতার গীতরূপই সাম-সংহিতা হিসেবে পরিচিত। কৌসুম[৩০], নারায়ণী এবং জৈমিনী নামে সামবেদের এ তিটি শাখা ছাড়া অন্য কোনো শাখা বর্তমানে পাওয়া যায় না। সামবেদের সংহিতাগুলো মূলত ঋক-সংহিতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ মন্ত্রগুলোই ঋক সংহিতার পুনরাবৃত্তি। এর মোট ১৮১০টি মন্ত্রের মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া বাকি সবগুলো ঋক-সংহিতায় পাওয়া যায়। তবে ঋক সংহিতার মন্ত্রগুলোর সাথে সাম-সংহিতার মন্ত্রগুলোর প্রধান পার্থক্য হলো ঋকের মন্ত্রগুলো গান-রহিত, আর সামের মন্ত্রগুলো গান-সংযুক্ত। মূলত ঋকের মন্ত্রগুলোতে সুর সংযোজন করলে যা পাওয়া যায় তাই সাম। ভাষ্যকারদের মতে, ঋকবেদের যে মন্ত্র দ্বারা দেবতাদের আহবান করা হয়েছে, সামবেদে সেই মন্ত্র দ্বারা দেবতাদের কীর্তন করা হয়েছে।

সাম-সংহিতার শাখাত্রয়কে আর্চিক এবং গান - এ দুভাগে ভাগ করা যায়। আর্চিকের প্রায় মন্ত্রগুলোই ঋকবেদের শাকল-সংহিতা থেকে নেয়া হয়েছে। আর্চিক আবার পূর্বাচিক ও উত্তরার্চিক, এ দুভাগে বিভক্ত। পূর্বাচিক ভাগে দেবতা ও ছন্দের ক্রম অনুসারে মন্ত্রগুলোকে সাজানো হয়েছে। এর এক একটি মন্ত্রে এক একটি সাম উৎপন্ন হয়। আর্চিক শাখাটি আবার আগ্নেয়, ঐন্দ্রেয়, পাবমান এবং অরণ্য এই

---

৩০. কেউ কেউ মনে করেন যে, এ শাখার নাম কৌথম নয়, 'কৌসুম'। কেননা সাম প্রাতিশাখ্যের নাম 'পুষ্প সূত্রম', 'কুসুমসূত্রম' বা 'কৌসুম সূত্রম'।

চারভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটি ভাগে ঋকবেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোমের মন্ত্র সংগৃহীত। অরণ্যভাগে রয়েছে অন্যান্য দেবতার মন্ত্র। অরণ্যকাণ্ড আবার অর্ক, দ্বন্দ্ব এবং ব্রত নামে তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তরার্চিকে মন্ত্রগুলো সজ্জিত হয়েছে যজ্ঞাদির ক্রম-অনুসারে।

সামবেদের দ্বিতীয় ভাগের নাম গান-সংহিতা। সুরের স্বরলিপি সংহিতার যে অংশে সঙ্কলিত হয়েছে তার নাম গান-সংহিতা। বিদ্বানদের মতে, গান-সংহিতা চারটি : যথা গ্রামগেয় গান, অরণ্যগেয় গান, উহ্গান এবং উহ্যগান। গ্রামাঞ্চলে গীত গানকে বলে গ্রামগেয় গান। গ্রামাঞ্চলে নিষিদ্ধ কিন্তু অরণ্যে গীত গানকে বলে অরণ্যগেয় গান। যজ্ঞানুষ্ঠানে গানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হয় তার নির্দেশ হলো উহ্গান যা উহ্য নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

সাম-সংহিতার পর আসে যজু:-সংহিতা। যজু:-সংহিতাকে কখনো কখনো কর্ম-সংহিতা বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। যজ্ঞই কর্মের সার। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে পার্থিব দ্রব্য পরিত্যাগ করা হয় তা-ই যজ্ঞ। যজ্ঞের প্রধান তিনটি সাধন হচ্ছে দেবতাদের আবাহন ও প্রশস্তি পাঠ, দেবতাদের স্তুতি কীর্তন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে পার্থিব দ্রব্যের আহুতি দান। যিনি দেবতাদের প্রশস্তি পাঠ করেন তিনি হোতা, আর তার সঙ্কলনই ঋক-সংহিতা নামে খ্যাত। যিনি স্তুতি কীর্তন করেন তিনি উদ্গাতা, সাম-সংহিতা তাঁরই গেয় মন্ত্রের সঙ্কলন। যিনি আহুতি দেন তিনিই অধ্বর্যু। আর যে শাস্ত্রের সাহায্যে তিনি এ কাজ করেন, তাই যজু:-সংহিতা।

কৃষ্ণ এবং শুক্ল নামে যজু:-সংহিতার দুটি প্রধান ধারা হিন্দুসমাজে সমাদৃত। সংস্কৃত কৃষ্ণ এবং শুক্ল শব্দের বাংলা অর্থ হলো যথাক্রমে মিশ্রণ এবং অবিমিশ্রণ। সুতরাং যে সংহিতায় যজুর্বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের মিশ্রণ রয়েছে তা কৃষ্ণ-সংহিতা, আর যে সংহিতায় কেবল মন্ত্রের সংগ্রহ রয়েছে, তা শুক্ল-সংহিতা নামে পরিচিত। যজুর্বেদের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। কৃষ্ণ-যজু:র শাখার মধ্যে কাঠল, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়ণী এবং তৈত্তিরীয় উল্লেখযোগ্য। শুক্ল-যজু:র শাখার মধ্যে কান্ব ও মাধ্যন্দিন উল্লেখযোগ্য। অখণ্ড যজু:-সংহিতার উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হলো অগ্নাধ্যান, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পাণ্ডযাগ, দীক্ষা, সোমযোগ, রাজপেয়, রাজশূর, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী, এবং অগ্নিচয়ন।

চতুর্থ ও সর্বশেষ সংহিতা হলো অথর্ব-সংহিতা । অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু,- এ তিনজন প্রাজ্ঞ ঋষি অথর্ববেদের পিতৃপুরুষ হিসেবে সমধিক পরিচিত। ভাষ্যকারদের

মতে, ঋকবেদের সাথে অথর্ববেদের পিতৃপুরুষ সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ঋকবেদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ মন্ত্র অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এর পাদবদ্ধ মন্ত্রগুলোও ঋক নামে পরিচিত। এ থেকে একথা অনুমান করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, মন্ত্র রচনার যে ধারা আমরা বেদত্রয়ের মধ্যে দেখতে পাই, অথর্ববেদে পাওয়া যায় তারই অনুবৃত্তি। তবে বেদত্রয়ের সাথে তার এক মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। বেদত্রয়ের বিনিয়োগ যেখানে মূলত শ্রৌত কর্মকাণ্ডে, অথর্ববেদের প্রধান বিনিয়োগ সেখানে গৃহকর্মকাণ্ডে।

সম্ভবত সংরক্ষণের অপর্যাপ্ততার কারণেই অথর্ববেদের যে ৯টি শাখা আছে তাদের সবগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেদবিশারদরা শৌণক ও পিপ্পলাদ নামে দুটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। শৌণক শাখা ৭৩১টি সূক্তে ৫০,৯৮৭ টি মন্ত্র নিয়ে গঠিত। সূক্তগুলো মোট ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত। মন্ত্রগুলো গদ্য এবং পদ্য উভয় ধরনেই দেখতে পাওয়া যায়।

অথর্ব-সংহিতার ২০টি কাণ্ড তিনটি পৃথক ভাগে বিভক্ত। প্রথম থেকে সপ্তম কাণ্ড নিয়ে প্রথম ভাগ গঠিত। এ ভাগটিতে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের বিধান আলোচিত হয়েছে। বিবাহ ও গর্ভধান পদ্ধতিও এ ভাগে আলোচিত হয়েছে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ কাণ্ড নিয়ে অথর্ব-সংহিতার দ্বিতীয় ভাগ গঠিত। এ ভাগে ঔপনিষদীয় ভাবনার আধিক্য বেশি। ত্রয়োদশ থেকে বিংশ কাণ্ড নিয়ে তৃতীয় ভাগ গঠিত। বিবাহ প্রকরণ, ব্রাজ প্রশংসা এবং শান্তিদানের মন্ত্রগুলো এ ভাগে আলোচিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ : সংহিতার পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে ব্রাহ্মণ। 'ব্রহ্মণ' থেকে ব্রাহ্মণ শব্দটির উৎপত্তি। সাধারণ অর্থে ব্রাহ্মণ বলতে বোঝায় 'ব্রহ্ম সম্পর্কিত বিচার'। কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণ অর্থে একদল ধর্মপ্রচারক বা পুরোহিতকে বুঝিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে যজ্ঞ ও যজ্ঞের বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে পুরোহিতদের উক্তিসমূহ যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাকে বলে ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে প্রাচীন মীমাংসকরা ব্রাহ্মণের কোনো স্বতন্ত্র লক্ষণ আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, যে সমস্ত বেদবচন ইষ্টার্থের প্রদোচক তা সংহিতা, আর অবশিষ্ট সবই ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণের বেদত্বই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণে শুধু যাগ-যজ্ঞের কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বক্তব্য থেকে ব্রাহ্মণের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। জৈমিনি, ম্যাক্সমূলার, রাধাকৃষ্ণাণ এবং আরো অনেক পণ্ডিতই ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকার করেছেন। রাধাকৃষ্ণাণের মতে, যে শাস্ত্রে ধর্মীয় আদেশ এবং

কর্তব্যসমূহ বিধিবদ্ধ থাকে তাই ব্রাহ্মণ।[৩৩] ঋষি আপস্তম্ভের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ব্রাহ্মণের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁর মতে, বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, পুরাকল্প, প্রশংসা এবং পরকৃতি নামক এ ছয়টি বিষয় ব্রাহ্মণে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক ঋক-সংহিতার সাথে যুক্ত ব্রাহ্মণের কথা। ঋক-সংহিতায় রয়েছে দেবতাদের প্রতি প্রশস্তির বন্দনা, আর তার ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যজ্ঞানুষ্ঠানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পদ্ধতি। ঐতরেয় এবং শাঙ্খায়ন নামে ঋক-সংহিতার দুটি ব্রাহ্মণ সুপ্রচলিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মোট ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে একেকটি পঞ্চিকা গঠিত। সুতরাং ঋক-ব্রাহ্মণে পঞ্চিকার সংখ্যা মোট আটটি। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চিকাকে ঋক ব্রাহ্মণের প্রাচীনতম অংশ বলে পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন। ঋষি ঐতয়ের হলেন এ ব্রাহ্মণের সংকলয়িতা। অগ্নিহোত্র, সোমযোগের প্রকৃতি, অগ্নিষ্টোম, গরামায়ন এবং রাজসূর প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞের বিশদ বিবৃতি ও বিশ্লেষণ রয়েছে এ ব্রাহ্মণে। ঋষি কৌষিতক হলেন শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের সঙ্কলয়িতা। এতে মোট ত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে। অগ্নিধ্যান, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌণমাস এবং চতুর্মাস্য প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞের বিবরণ রয়েছে ব্রাহ্মণের ছয়টি অধ্যায়ে। আর সপ্তম অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রয়েছে সোমযোগের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা।

সাম-সংহিতায় মোট নয়টি ব্রাহ্মণ স্বীকৃত। বিদ্বানগণ এই ব্রাহ্মণগুলোকে প্রধান ও অপ্রধান – দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রধান ব্রাহ্মণ তিনটি এবং অপ্রধান ব্রাহ্মণ ছয়টি। প্রধান ব্রাহ্মণ তিনটি হলো জৈমিনি, অন্ত্য এবং ছান্দোগ্য। পণ্ডিতদের মতে, জৈমিনি সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ। এটি মোট আটটি অধ্যায় বা পর্বে বিভক্ত। এদের প্রথম তিনটি পর্ব কর্ম ব্রাহ্মণ, চতুর্থ থেকে সপ্তমপর্ব উপনিষদ ব্রাহ্মণ এবং শেষ পর্বটি অর্থেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ঋষি জৈমিনি এ ব্রাহ্মণের সঙ্কলক। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত করেন ঋষি তাণ্ড্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে জৈমিনি ব্রাহ্মণ এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ প্রায় একই। ভেদ শুধু এটুকুই যে, জৈমিনি ব্রাহ্মণের আখ্যান ভাগ তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ভাগ থেকে একটু বেশি সমৃদ্ধ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণটি মোট দশটি প্রপাঠকে বিভক্ত। এদের প্রথম দুটি প্রপাঠকে গৃহকর্মের সূত্র সংগৃহীত, আর অবশিষ্ট আটটি প্রপাঠকে প্রখ্যাত ছান্দোগ্য উপনিষদের সারভাগ বিবৃত আছে। এ তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ ছাড়া সাম-

---

৩১. S. Radhakrishnan., *op. cit,*, পৃ. ৬৫

সংহিতার আরো ছয়টি অপ্রধান ব্রাহ্মণ রয়েছে। যেমন : ১. ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ২.সমবিধান ব্রাহ্মণ, ৩. আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, ৪. দৈবত বা দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, ৫. সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ এবং ৬. বংশ ব্রাহ্মণ। এই অপ্রধান ব্রাহ্মণগুলোকে 'অণুব্রাহ্মণ'ও বলা হয়ে থাকে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক সংহিতার কোনো পৃথক ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া না গেলেও তৈত্তিরীয় শাখার তৃতীয় কাণ্ডের অন্তে অবস্থিত তিনটি প্রপাঠককে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মৈত্রায়ণী শাখার কোনো ব্রাহ্মণ নেই। কপিষ্ঠল শাখারও কোনো ব্রাহ্মণ নেই। তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকের নচিকেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে একটি ব্রাহ্মণ রয়েছে। ব্রাহ্মণটিতে মোট একশতটি অধ্যায় রয়েছে ; আর এ কারণেই এটি শতপথ ব্রাহ্মণ হিসেবে সমধিক পরিচিত।

অথর্ববেদে মাত্র একটি ব্রাহ্মণ রয়েছে। বেদ বিশারদরা এর নাম দিয়েছেন গোপথ ব্রাহ্মণ। এতে আদি ভাগ ও উত্তর ভাগ নামে দুটি বিভাগ রয়েছে। আদি ভাগে রয়েছে পাঁচটি, আর উত্তরভাগে রয়েছে দুটি প্রপাঠক। বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর আলোচ্যসূচির প্রায় অধিকাংশই অন্যান্য ব্রাহ্মণ থেকে ধার করে নেয়া। তবে ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্য, গুরুসেবা, পাঠ অধ্যয়ন এবং ছাত্রের আচরণের প্রতি এ ব্রাহ্মণ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আরণ্যক : ব্রাহ্মণের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে আরণ্যক। যাগ-যজ্ঞাদির কার্যকলাপ থেকে বৈদিক যুগের আর্যদের চিত্ত যখন জ্ঞানমার্গের পথে আকৃষ্ট হতে থাকে তখনই হয় আরণ্যকের উৎপত্তি। 'অরণ্যে উক্তম্ ইতি আরণ্যকম্'— অরণ্যে যা উক্ত হয় বা হয়েছে তাকে বলে আরণ্যক। যে সমস্ত শিষ্য ব্রহ্ম ও তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাঁদেরকে আচর্যবৃন্দ নিরিবিলি স্থান তথা অরণ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেন বলেই সম্ভবত কেউ কেউ অধ্যাত্মবিদ্যা যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে আরণ্যক নামে আখ্যাত করেছেন। অন্যদিকে কোনো কোনো পণ্ডিত আবার আরণ্যককে ব্রহ্ম শব্দের সমার্থক বলে ঘোষণা করে বলেন, অরণ্যে যেমন গভীর ও নিবিড় তত্ত্ব বিরাজমান, তেমনি ব্রহ্মেও তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং যে শাস্ত্রে ব্রহ্ম সম্পর্কিত গভীর ও নিবিড় জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে তাই আরণ্যক।

প্রথমেই ঋক-সংহিতার কথা ধরা যাক। ঋক-সংহিতার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশেষ হলো ঐতরেয়-আরণ্যক। আর শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের পরিশেষ হলো শাঙ্খায়ন

আরণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এদের প্রতিটি ভাগই আরণ্যক নামে পরিচিত। এর প্রথম ও শেষভাগে রয়েছে মহাব্রতের রহস্যের ভাবনা।[৩১] শাঙ্খায়ন আরণ্যক পনেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর দশম অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্রের এবং একাদশ অধ্যায়ে স্বপ্নফলের বিবরণ আছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রয়েছে বৈদিক সাহিত্যের সারভাগের উপদেশ।

সাম-সংহিতার আরণ্যক গ্রন্থ দুটি। যথা ছান্দোগ্য আরণ্যক এবং জৈমিনীয় উপনিষদীয় ব্রাহ্মণ আরণ্যক। যজুর্বেদ-সংহিতায় মোট দুটি আরণ্যক স্বীকৃত। এর একটি কৃষ্ণযজুর্বেদের, আর অন্যটি শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত। কৃষ্ণ-সংহিতার সাথে যুক্ত আরণ্যকের নাম তৈত্তিরীয় আরণ্যক। এতে মোট দশটি প্রপাঠক রয়েছে। কাঠক, কপিষ্টল ও মৈত্রায়ণী শাখার কোনো আরণ্যক স্বীকৃত নেই। আর শুক্ল-সংহিতার সাথে যুক্ত রয়েছে বৃহদারণ্যক। এটি মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম তিনটি অধ্যায়ে রয়েছে প্রবর্গ্যবিধির আলোচনা, আর বাকি ছয়টি অধ্যায়ে নিহিত আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের সারকথা। অথর্ববেদের কোনো আরণ্যক স্বীকৃত নয়।

উপনিষদ : উপনিষদ হচ্ছে বেদের সর্বশেষ পর্যায়। উপ+নি+সদ থেকে উপনিষদ কথাটির উৎপত্তি। 'উপ' দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়, আর 'সদ্' ধাতুর অর্থ-প্রাপ্তি বা বিনাশ। এ দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতীচ্যের চিন্তাবিদরা উপনিষদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, অরণ্যে আচার্যের কাছে উপবিষ্ট হয়ে বসে এক মনে শিষ্য যে বিদ্যা লাভ করে তাই উপনিষদ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, আচার্যের কাছে উপবিষ্ট হয়ে বিদ্যা গ্রহণের প্রমাণ বহু জায়গায় থাকলেও 'বসা' অর্থে উপনিষদের ব্যবহার উপনিষদের কোথাও পাওয়া যায় না।[৩৩]

পূজপাদ্য শঙ্করাচার্য উপনিষদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, যা অবিদ্যা নাশ করে তাই উপনিষদ।[৩৪] যদিও আধুনিক কালের অনেক বিদ্বানই এজন্য তাঁর প্রতি কটাক্ষ প্রদর্শন করেছেন। শঙ্করাচার্যের অর্থের সাথে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মিল না থাকলেও

---

৩২ সায়নাচার্যের মতে, এটি আরণ্যকের কর্মকাণ্ড, আর বাকি কয়টি জ্ঞানকাণ্ড। অবশ্য সায়নাচার্যের মতের সাথে অনেকেই এখানে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

৩৩. কেবল ছান্দোগ্য উপনিষদের দু'এক জায়গায় 'কাছে যাওয়া' অর্থে এর ব্যবহার আছে। তবে এ উপনিষদের অন্যত্রই আবার বলা হয়েছে, এ ব্যবহারটা বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। 'তত্ত্বাভ্যাস' অর্থেই একে ব্যবহার করা হয়েছে. সুতরাং 'কাছে যাওয়া' বা 'বসা' অর্থে উপনিষদের ব্যবহার রীতির কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

৩৪. বৃহদারণ্যক, কঠ, মুণ্ডক এবং প্রশ্ন উপনিষদের শংকর-ভাষ্য দেখুন।

এর একটা বৌদ্ধিক ও দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে। সোমযোগের আলোচনায় আমরা 'উপষৎ' নামে একটা ইষ্টির বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। উক্ত বিধানে কথিত আছে অসুরেরা নাকি পৃথিবীতে লোহার, অন্তরীক্ষে রূপার এবং দ্যোলকে স্বর্ণের তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলো। দেবতারা যে ইষ্টির সাহায্যে এ দুর্গগুলো ভেঙেছিলেন, সেই ইষ্টটি ছিলো 'উপষৎ'। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যাপারটি হলো অবিদ্যার দুর্গ ভাঙ্গা, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে 'অবিদ্যা গ্রন্থির বিকিরণ'। এই 'উপষৎ' আর 'উপনিষদ' একই ভাবনার দুটি ধারা মাত্র। সুতরাং এ অর্থে শঙ্করাচার্য কর্তৃক উপনিষদের সংজ্ঞা অমূলক বলে মনে হয় না।

প্রথমেই ধরা যাক ঋক-সংহিতার কথা। ঋক-সংহিতার দুটি উপনিষদ রয়েছে। এদের প্রথমটি ঐতরেয়োপনিষদ, যা ঐতরেয়ারণ্যকের অন্তর্গত। দ্বিতীয়টি কৌষীতক্যোপনিষদ, যা শাঙ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত। ঐতরেয়োপনিষদ তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রধান আলোচ্য আত্মতত্ত্ব। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যটি এ উপনিষদেরই অন্তর্ভুক্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে আত্মার তিনটি জন্মের কথা। প্রথম জন্ম হলো পুরুষ দ্বারা স্ত্রীর মধ্যে ভ্রূণরূপে। দ্বিতীয় জন্ম হলো স্ত্রীর গর্ভ থেকে ধরাধামে কুমাররূপে। তৃতীয় জন্ম হলো প্রয়াণের পর উৎক্রান্তির ফলে স্বর্গবাসী রূপে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে আত্মার স্বরূপের বিশ্লেষণ। কৌষীতক্যোপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে দেবঋণ, পিতৃঋণ, প্রাণবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যার বিচিত্র কথা।

সামবেদেরও দুটি উপনিষদ রয়েছে- কেনোপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ। কেন? অর্থাৎ কার মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ এবং নক্ষত্রাদি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? —এই মহামূল্য প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস হিসেবে ব্রহ্মার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে কেনোপনিষদে। উপনিষদটির প্রথম দুটি খণ্ডে বাক, চক্ষু, শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়ে যে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, এ সত্যই বিধৃত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্ম জানা এবং অজানার বাইরে। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে হৈমবতী উমার উপাখ্যান। এই উপাখ্যানের মাধ্যমেই ইন্দ্র ব্রহ্ম রহস্য জানতে পেরেছিলেন।[৩৫] উপাখ্যানের অন্তভাগে ব্রহ্মা সম্পর্কে কিছু বিবৃতি রয়েছে।

---

৩৫. উমা উপাখ্যান নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। পুরাণে উমা শিব-পত্নী হিসেবে পরিচিতা। কেউ কেউ মনে করেন যে, উমা এবং শিব কেউই বৈদিক দেবতা নন। এ ধারণা একটা অনুমান মাত্র। শঙ্করাচার্য উমাকে দেব-পত্নী হিসেবেই ব্যাখ্যা

ছান্দোগ্য হচ্ছে একটা বৃহৎ উপনিষদ। মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই উপনিষদে মধুবিদ্যা, কোষবিদ্যা, পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যা, সংকর্ষবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ভূমিবিদ্যা, দহনবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কর্মের পরিসমাপ্তি যে জ্ঞানে, এই মহোপদেশ ছান্দোগ্য উপনিষদে বিধৃত হয়েছে।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের উপনিষদগুলোর মধ্যে মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়, কঠ এবং শেতাশ্বতর-ই উল্লেখযোগ্য। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকটি মহানারায়ণ এবং সপ্তম থেকে নবম প্রপাঠকের সমবায়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ গঠিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষা ও জীবনাদর্শের রূপ কি হওয়া উচিত তা বর্ণিত হয়েছে। অণুকে ব্রহ্মবিদ্যায় সাধনরূপে গ্রহণ করা এ উপনিষদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তারপর কঠ উপনিষদের কথা। এটি দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। আত্মবিদ্যা ও যোগবিধির আলোচনাই এর মুখ্য বিষয়। শেতাশ্বতর উপনিষদ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। দার্শনিক ভাবনার প্রাচুর্য এ উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের আদি উপাদান কি[৩৬] – এ প্রশ্নটি উত্থাপনের মাধ্যমেই উপনিষদটির শুরু। এখানে পরম দেবতাকে বিশ্বের আদি উপাদানরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শুক্ল-যজুর্বেদের দুটি উপনিষদ – ঈশ এবং বৃহদারণ্যক। ঈশ উপনিষদটি সংহিতার অন্তর্গত বলে এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্য কোনো উপনিষদই সংহিতার অন্তর্গত নয়, আরণ্যকের অন্তর্গত। অনুশাসনের আলোচনা দিয়েই উপনিষদটির শুরু হয়েছে। অনুশাসনগুলোর মধ্যে 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো', 'কারো ধনে লোভ করো না?', 'কর্ম করেই শত বছর বেঁচে থাকার চেষ্টা করো' উল্লেখযোগ্য। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যকের শেষ দুটি অধ্যায় নিয়ে প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক উপনিষদ গঠিত। অশ্বমেধের রহস্যকাহিনী, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের উপাখ্যান, প্রাণের উপাসনা, আত্মবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, সপ্তান্ন রহস্যকাহিনী হচ্ছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অথর্ববেদের তিনটি উপনিষদ – প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য। পিপ্পলাদ প্রশ্ন-উপনিষদের প্রবক্তা। ছয়জন ঋষির ছয়টি প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করেছেন এ উপনিষদে। প্রশ্নগুলো হলো : প্রজা সৃষ্টি কি করে হলো ? কয়জন দেবতা প্রজাকে

করেছেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য কেনোপনিষদের শংকর-ভাষ্য দেখুন।

৩৬. উল্লেখ্য বিশেষ আদি উপাদান কি? এ প্রশ্নের উত্তরানুসন্ধান নিয়েই শুরু হয়েছিলো প্রতীচ্যের মাইলেসীয় দর্শন। শেতাশ্বতর উপনিষদের সাথে মাইলেশীয় দর্শনের সাদৃশ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ধরে আছেন? কোথা থেকে প্রাণ জন্মালো? মানবাত্মার মধ্যে কে ঘুমায়? প্রয়াণকাল পর্যন্ত অঙ্গারের অনুধ্যানে কোন্ লোক জয় করা যায়? এবং ষোলকলা সম্পন্ন কোথায় আছেন? এ ছয়টি প্রশ্ন এবং তার মীমাংসাই প্রশ্নোপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মুণ্ডক উপনিষদের পিতৃপুরুষ হলেন অঙ্গিরস এবং শৌণক। এর তিনটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মবিদ্যাই এ উপনিষদের প্রধান আলোচ্যসূচি। মাণ্ডূক্য উপনিষদের কোনো প্রবক্তার নাম আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।[৩৭] এ উপনিষদটি মোট বারোটি মন্ত্রে বিভক্ত। এর একমাত্র প্রতিপাদ্য হলো চতুর্মাত্র ওঙ্কারের তত্ত্ব।

এতক্ষণ বৈদিক সাহিত্যের যে চারটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো, বিদ্যার দিক দিয়ে সংহিতা হচ্ছে অখণ্ড বেদের প্রথম পর্যায়। ব্রাহ্মণ তার দ্বিতীয় পর্যায়। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক পরিণতি আরণ্যকে, আর আরণ্যকের স্বাভাবিক পরিণতি উপনিষদে। ব্রাহ্মণে আছে যাগযজ্ঞের আলোচনা, আরণ্যকে রহস্যের আলোচনা, আর উপনিষদ হচ্ছে বেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণে যেসব যাগ-যজ্ঞের কথা উক্ত আছে, আরণ্যকে দেখা যায় তারই মুখ্য ভাবনা ; আর উপনিষদে রয়েছে এদেরই তাত্ত্বিক জ্ঞান। তবে স্মর্তব্য যে এসবকে নিয়েই কিন্তু গঠিত হয়েছে অখণ্ড বৈদিক সাহিত্য। একই অনুভূতি ও একই ভাবাদর্শের পরামর্শ প্রত্যেক পর্যায়েই আলোচিত হয়েছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে। এবার ওপরে আলোচিত অখণ্ড বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে সহজে স্মরণ রাখার জন্য আমরা নিম্নোক্ত তালিকাটি ব্যবহার করতে পারি।

এবার ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিকাশে বেদের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা যাক। একথা শুরুতেই বলে রাখা আবশ্যক যে, বেদ হচ্ছে ভারতীয় দার্শনিক ও আর্য-গোষ্ঠীর যুগ-যুগান্তরের অনলস চিন্তা এবং সুগভীর সাধনার ফল। বর্তমান প্রসঙ্গে বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে আমরা যে রূপরেখা দিয়েছি, তাকে স্বীকার বা অস্বীকার করার মধ্যে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মর্মকথা নিহিত। এ কারণে অনেকেই বেদকে ভারতীয় দর্শনের যাত্রাবিন্দু বলে অভিহিত করেছেন। অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, ভারতীয় দার্শনিক মানসে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে

৩৭. অবশ্য চরণব্যূহের মতে ঋক-সংহিতার একজন শাখা প্রবর্তক মাণ্ডুকায়নই ছিলেন মান্ডূক্য উপনিষদের প্রবক্তা। কিন্তু চরণব্যূহের এ মন্তব্যের সাথে আধুনিক বিদ্বানদের অনেকেই একমত হতে পারেননি।

যেসব ধ্যান-ধারণা ছিলো কার্যকরী, তাই যেনো ঋষিদের কাছে বিভিন্ন সূত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে। কেউ কেউ সূত্রগুলোকে স্বীকার করে, আর কেউ অস্বীকার করে স্বীয় দার্শনিক মতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রথমেই ধরা যাক বেদবিরোধী তথা নাস্তিকদের কথা।

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
ঋক-সংহিতা	১. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২. শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ	১. ঐতরেয়ারণ্যক ২. শাঙ্খায়নারণ্যক	১. ঐতরেয়োপনিষদ ২. কৌষীতকি উপনিষদ
সাম-সংহিতা	১. তাণ্ড্য, ২. ষড়বিংশ ৩. সামবিধান, ৪. আর্ষেয় ৫. দৈবত, ৬. ছান্দোগ্য, ৭. জৈমিনীয়, ৮. সংহিতোপনিষদ ৯. বংশ	১. ছান্দোগ্য আরণ্যক ২. জৈমিনীয় ঔপনিষদীয় ব্রাহ্মণারণ্যক	১. ছান্দোগ্য উপনিষদ ২. কেন উপনিষদ
কৃষ্ণযজু: সংহিতা	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ	তৈত্তিরীয়ারণ্যক	১. কঠোপনিষদ, ২.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩. মহানারায়ণ উপনিষদ, ৪. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৫. মৈত্রায়ণী উপনিষদ
শুক্লযজু: সংহিতা	শতপথব্রাহ্মণ	বৃহদারণ্যক	১. বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২. ঈশ উপনিষদ
অথর্ব-সংহিতা	গোপথ ব্রাহ্মণ	X	১. প্রশ্ন উপনিষদ ২. মুণ্ডক উপনিষদ, ৩. মাণ্ডুক্য উপনিষদ

বেদের বিরুদ্ধে প্রথমেই আপত্তি ওঠে লোকায়ত চার্বাকদের তরফ থেকে। তাঁরাই প্রথম বেদের পবিত্রতা খণ্ডনের মাধ্যমে নিজেদের দার্শনিক ভাবধারা প্রচার করেন। বেদের পবিত্রতা খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, বেদে এমন অনেক উক্তি আছে, যেগুলো সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং পরস্পর বিরোধী। যেমন, বেদের জ্ঞানপর্বে বলা

হয়েছে 'অন্নং ব্রহ্মোতি ব্যাজানাৎ' , 'প্রাণং ব্রহ্মোতি ব্যাজানাৎ'[৩৮]। এ উক্তিগুলোতে 'অন্ন' ও 'প্রাণ'কে ব্রহ্ম হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। চার্বাক মতে, এসব উক্তি কাল্পনিক এবং পরস্পর বিরোধী। জৈন এবং বৌদ্ধদর্শনও বিকশিত হয়েছে বেদের বিরোধিতা থেকে। বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ সরাসরিভাবে বৈদিক পূজার্চনাদি এবং ব্রহ্মের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। মূলত গৌতম বুদ্ধের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে এবং তাঁর জীবনকালেও ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শনের এক মহাপ্লাবন বয়ে যায়। ব্রহ্মজালসূত্র থেকে আমরা এ সত্য জানতে পারি যে, তখন ভরতবর্ষে দর্শনের ৬২টি শাখা প্রচলিত ছিলো। এদের অধিকাংশই ছিলো পুরোপুরি বেদ-বিরোধী। কিন্তু অন্যান্য শাখার ঋষিরা বেদের মন্ত্রানুসারে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাখায় নিয়োজিত ছিলেন। তবে সে যাই হোক, নাস্তিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের সব পণ্ডিতই কিন্তু বেদকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তাঁদের দর্শনের সূচনা করেন। এদিক থেকে তাঁদের দর্শনেও বেদের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়।

চার্বাক বা লোকায়ত কর্তৃক বৈদিক ধ্যান-ধারণা তীব্রভাবে সমালোচিত হওয়ার পর থেকে গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের ধর্মীয় প্রত্যয়াবলিকে সুদৃঢ় যুক্তিবাদী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। আর এর ফলেই হিন্দুদর্শনের মধ্যে ছয়টি আস্তিক্যবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যাঁরা বেদের অভ্রান্ত সত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁরাই আস্তিক্যবাদী হিসেবে পরিচিত হন। এ আস্তিক্যবাদী দর্শনের মধ্যে রয়েছে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। এই ছয়টি আস্তিক্যবাদী দার্শনিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে। এমনকি ঔপনিষদীয় চিন্তাধারার সময়ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। এভাবে বহু শতাব্দী ব্যাপী চিন্তাধারার ফলে আস্তিক্যবাদী দর্শনের চিন্তাধারায় এক বৃহৎ বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যের সূত্রগুলোকে সুসংবদ্ধ করার জন্য একদল মনীষী আত্মনিয়োগ করেন। এসব মনীষীর মধ্যে বাদরায়ণের দ্বারা রচিত হয় ব্রহ্মসূত্র, যাকে বেদান্ত দর্শনের প্রাণস্পন্দন হিসেবে আখ্যাত করা চলে।

এভাবে বেদের আলোচনা করলে দেখা যায়, বেদের গুরুত্ব ভারতীয় দর্শনে সর্বাধিক। বেদকে কেন্দ্র করেই ষড়দর্শনের উৎপত্তি, আর বেদ যে অপৌরুষেয় তার

---

৩৮. *সায়নমাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ, ১ম খণ্ড,* অনুবাদ : অধ্যাপক সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৮

বিরোধিতা থেকেই লোকায়ত, জৈন এবং বৌদ্ধদর্শনের বিকাশ। হিন্দুধর্মে যদিও পরবর্তীকালে তন্ত্রের মাধ্যমে শাক্ত পূজা বা শিব-সংহিতার মাধ্যমে শৈবপূজার প্রচলন হয়েছে, তবু বেদের গুরুত্ব আজো হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিতে অব্যাহত রয়েছে। এ কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হিন্দু সমাজকে 'বেদপন্থী সমাজ' এবং হিন্দু দর্শনকে 'বেদপন্থী দর্শন' বলে আখ্যাত করেছেন।[৩৯] হিন্দু ধর্ম এবং দর্শনের বিকাশে বেদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : "বেদ হিন্দু ধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র এবং বৈদিক দর্শন ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। অধুনা যে সকল ধর্ম ও দর্শন বিশাল ভারতে প্রচলিত তাদের মূল বীজ বেদেই নিহিত। ভারতীয় সর্বধর্ম সম্প্রদায় বেদবাক্য দ্বারা স্ব স্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। ষড়দর্শন, শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত, স্বামী রামানুজাচার্যের বিশিষ্ট অদ্বৈত বেদান্ত, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, মাধবাচার্যের দ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, চৈতন্যাচার্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, প্রাচীন আর্য সমাজ প্রভৃতির মূল উৎস বেদ। তাই বেদ মানবজাতির আদিগ্রন্থ।"[৪০] সুতরাং, ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতার মূলে যে বেদের গুরুত্ব সর্বাধিক, তা সহজেই অনুমেয়।

উপনিষদ

উপনিষদ ভারতীয় ঋষি-মুনিদের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মূল সূতিকাগার হিসেবে এ সর্বজন নমস্য। সংক্ষেপে উপনিষদকে বেদান্ত নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে।[৪১] উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের সর্বশেষে অবস্থিত বলেই এ নামে তাকে অভিহিত করা হয়। উপনিষদ কোনো সুগ্রথিত দার্শনিক গ্রন্থ নয়, যদিও দার্শনিক উপাদানে উপনিষদগুলো ভরপুর। যে সমস্ত মুনি ঋষির উপলব্ধ সত্য উপনিষদে স্থান পেয়েছে তাঁদের বড় পরিচয় তাঁরা হলেন অতীন্দ্রিয় সত্যদ্রষ্টা। দর্শনের গবেষক নন। কাহিনী, ব্যাখ্যা, উপদেশ, অনুব্যাখ্যা, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা ও কথোপকথনের আকারে তাঁরা উপনিষদগুলোর সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে উপনিষদের

---

৩৯. S.C. Chatterjee, *The Fundamentals of Hinduism*, Calcutta, 1980, পৃ. ১২

৪০. *Ibid*, পৃ. ২১০

৪১. বেদান্তো নাম উপনিষদ তৎপ্রামাণানি সূত্র ভাষ্যাদীনি।

তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা কাব্যগুণই সর্বাধিক।[৪২] উপনিষদের এ কাব্যগুণ সবার হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে।

উপনিষদ সংখ্যায় অনেক। এর কারণ হিসেবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সুদীর্ঘকাল ধরে উপনিষদকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে বলেই অনেক পরবর্তীযুগেও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও দর্শন সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা নিজেদের বক্তব্যের মর্যাদা বাড়াবার উৎসাহে 'উপনিষদ' নাম দিয়ে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্রাট আকবরের সময়ে রচিত 'আল্লা-উপনিষদ' নামের একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। ... এবং এই কারণেই শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপনিষদ রচিত হয়েছে ; সেগুলোর সংখ্যা ২৫০-এরও বেশি।"[৪৩] তবে প্রাচীনকালে এ সংখ্যা অনেক কম ছিলো। কালের চক্রে এ সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্বানদের মতে উপনিষদের জন্ম হয়েছিলো বৈদিক যুগে এবং ব্রাহ্মণের এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। বেদের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় আমরা মাত্র সাতটি উপনিষদ দেখতে পাই। আবার প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ পল ডয়সেন ষোলটি প্রাচীন উপনিষদের উল্লেখ করেছেন।[৪৪] এই ষোলটি উপনিষদের দুটির নাম আজো অজ্ঞাত। এই চৌদ্দটি উপনিষদই প্রাচীন উপনিষদ হিসেবে স্বীকৃত। এগুলো হলো : ১. ঈশ উপনিষদ, ২. ঐতরেয় উপনিষদ, ৩. কৌষীতকি উপনিষদ, ৪. তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৫. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৭. কেন উপনিষদ, ৮. কঠ উপনিষদ, ৯. শেতাশ্বতর উপনিষদ, ১০. প্রশ্ন উপনিষদ, ১১. মুন্ডক উপনিষদ, ১২. মাণ্ডূক্য উপনিষদ, ১৩. মৈত্রায়ণী উপনিষদ এবং ১৪. মহানারায়ণ উপনিষদ। অন্যদিকে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ফার্সি ভাষায় উপনিষদের যে অনুবাদ করেন তাতে তিনি পঞ্চাশ খানা উপনিষদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় আরো অনেক উপনিষদের নাম পাওয়া গিয়েছে। মুক্তিকা উপনিষদে মোট ১০৮ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। আবার বোম্বাই-এর নির্ণয় সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত এবং বাসুদেব শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত একখানা উপনিষদীয় সাহিত্যে ১২০ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তবে তাদের মধ্যে উপর্যুক্ত চৌদ্দখানা উপনিষদই প্রধান।

---

৪২. M. Hiriyanna, *Outlines of Indian Philosophy*, London, 1956, পৃ. ৫২

৪৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০-২১

৪৪. Paul Deussen, *The System of Vendanta*, University of Calcutta, 1959, পৃ. ৩৭

উপনিষদের সঠিক রচনাকাল এবং কোন্‌টির পর কোন্‌টি রচিত হয়েছিলো সে ব্যাপারে এখনো কোনো সার্বজনীন ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। প্রচলিত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের মতো উপনিষদ যেহেতু বেদেরই একটি অনিবার্য অংশ, সেকারণে এদের মতো উপনিষদকেও প্রাচীন বলে মানতে হয়। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ সম্ভবত এ কারণেই উপনিষদগুলোর বেশিরভাগ রচনাই বুদ্ধের জন্মের পূর্বে হয়েছে বলে মনে করেন।[৪৫] এদিকে লক্ষ্য রেখে কোনো কোনো প্রতীচ্য পণ্ডিত উপনিষদের রচনাকাল নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা উপনিষদগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক : বুদ্ধপূর্ব উপনিষদ (খ্রি. পূ. ১০০০–৩০০ অব্দ), দুই : বুদ্ধোত্তর উপনিষদ (৩০০–৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। শঙ্করাচার্য এই বুদ্ধোত্তর উপনিষদগুলোর ওপরই তাঁর ভাষ্য রচনা করেন। ঈশ উপনিষদ, ঐতরেয় উপনিষদ, কৌষীতকি উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং কেন উপনিষদ হচ্ছে প্রাচীন বা বুদ্ধ-পূর্ব উপনিষদ। আর বাকিগুলো বুদ্ধোত্তর উপনিষদ।

কোনো কোনো পণ্ডিত গীতাকে উপনিষদের নির্যাস সত্য বলে মনে করেন। গীতা হচ্ছে মহাভারতের অংশবিশেষ। তাই কোনো কোনো প্রাচীন উপনিষদ মহাভারতের পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কাজেই খ্রিস্টের জন্মের ৩০০০ থেকে ৬০০ অব্দের পূর্বে প্রাচীন উপনিষদগুলো রচিত হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে উপনিষদ প্রচারিত হয়েছে। তবে কঠ উপনিষদ অনেক পরের রচনা। সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শন কঠ উপনিষদের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে। সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের অনেক উপাদান কঠোপনিষদে রয়েছে। অথর্ববেদের উপনিষদগুলোকেও উত্তরকালের রচনা বলে বিদ্বানগণ মনে করে থাকেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও আমরা সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের অনেক উপাদান লক্ষ্য করি। আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিকাশের সময়।

সাধারণ দৃষ্টিতে উপনিষদকে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের সূতিকাগার বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আস্তিক বা বৈদিক এবং নাস্তিক বা অবৈদিক উভয় সম্প্রদায়ই উপনিষদ কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে। গুন্ডেনবার্গ মন্তব্য

---

৪৫. S. Radhakrishnan., *Indian Philosophy, Vol. 1*, London, 1961, পৃ. ১৪১

করেছেন, উপনিষদই বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের পথ সুগম করে দিয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের বেশ কয়েকটি মতবাদের ভিত্তিভূমি প্রোথিত রয়েছে উপনিষদে। বৌদ্ধ দর্শন আত্মার প্রচলিত ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নয়। তাই বৌদ্ধ দার্শনিকদের অনাত্মবাদী বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু এই অনাত্মবাদের বীজ উপনিষদেই নিহিত।[৪৬] বৌদ্ধ দর্শনের দু:খবাদ, ক্ষণিকত্ববাদ এবং পুনর্জন্মবাদের বীজও উপনিষদে নিহিত।[৪৭] অবৈদিক জৈনদর্শনও উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। জৈনদের আত্মা বিষয়ক মতে উপনিষদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সাংখ্য দর্শনে উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণবিষয়ক মতবাদ শেতাশ্বতর উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে।[৪৮] শেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে 'ত্রিবর্ণা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাংখ্যও সত্ত্ব, রজ: ও তম:- এই ত্রিগুণের আলোকে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া, সাংখ্য দর্শনের মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ বিষয়ক মতবাদে কঠোপনিষদের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে প্রতিভাস থেকে পরম সত্তা, অর্থসমূহ থেকে মন, মন থেকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি থেকে মহৎ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই মহত্ত্বের শীর্ষে আছেন অব্যক্ত, অব্যক্তর শীর্ষে পুরুষ। কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠ বলে দ্বিতীয় আর কিছু নেই।[৪৯] কঠোপনিষদের এ ধারণা সাংখ্য দর্শন আক্ষরিক অর্থে স্বীকার করে নিয়েছেন।

যোগদর্শনও উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। যোগদর্শনের বহুবিধ সিদ্ধান্তের সাথে উপনিষদের আক্ষরিক সাদৃশ্য রয়েছে। শেতাশ্বতর উপনিষদে যোগের যে অষ্টবিধ পন্থার কথা উল্লেখিত হয়েছে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাদের হুবহু স্বীকার করে নিয়েছেন। শেতাশ্বতর উপনিষদে প্রাণায়ামের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে- যিনি যথার্থ যোগী তিনি মাথা, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত রেখে শরীরকে সরল ভাবে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি ইন্দ্রিয়গুলোকে মনের সাথে মিলিয়ে গুরুর কাছে ব্রহ্মাবিষয়ক আলোচনা করেন। প্রাণবায়ু যদি ক্ষীণ হয়ে যায় তাহলে তিনি নাসিকার মধ্য দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করেন।[৫০] উপনিষদের প্রাণায়াম সম্পর্কিত এ বর্ণনা যোগদর্শনে পুরোপুরিভাবে

---

৪৬. **কঠোপনিষদ** – ১ : ১ : ২০

৪৭. **বৃহদারণ্যক উপনিষদ** – ৪ : ৪ : ২২

৪৮. **শেতাশ্বতর উপনিষদ** – ৪ : ৪ : ৫

৪৯. **কঠোপনিষদ** – ১ : ৩ : ১০–১২

৫০. **শেতাশ্বতর উপনিষদ** – ২ : ৮–৯

গৃহীত হয়েছে। যোগদর্শনের অষ্টবিধ পন্থা সম্পর্কিত মতবাদের পূর্বাভাস কঠোপনিষদেও লক্ষ্য করা যায়। যোগের স্বরূপ আলোচনায় কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, যে অবস্থায় মনের সঙ্গে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়শূন্য এবং বুদ্ধি তার আপন কার্যে উদাসীন হয় সে অবস্থাকে ঋষিরা পরমগতি বলে আখ্যাত করেছেন।[৫১] কঠোপনিষদের একথার সাথে যোগদর্শনের আক্ষরিক মিল রয়েছে। তাছাড়া যোগদর্শনের ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তাধারার পূর্বাভাসও কঠোপনিষদে লক্ষণীয়।[৫২]

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনও উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মোক্ষের ধারণাটি সর্বাংশে উপনিষদ থেকে নেয়া হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাঁদের মতে উপনিষদই হচ্ছে ন্যায়-বৈশেষিকের মোক্ষ সম্পর্কিত মতবাদের ভিত্তিভূমি। তাছাড়া বৈশেষিক দর্শনে আমরা পদার্থের যে আলোচনা দেখতে পাই তার সাথে শেতাশ্বতর উপনিষদের সাযুজ্য রয়েছে। আবার বৈশেষিক দর্শনের আকাশের স্বরূপ ও গুণের বিবরণ আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখতে পাই। ন্যায় দার্শনিকরা ঈশ্বরের স্বরূপ ও অস্তিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে উপনিষদ থেকে সাহায্য নিয়েছেন দুহাতে। তাই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে উপনিষদের অসামান্য প্রভাব রয়েছে।

বিশুদ্ধ অদ্বৈত বৈদান্তিক আচার্য শংকরের দর্শনে উপনিষদের প্রভাব সর্বাধিক। একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, উপনিষদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে শংকরাচার্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে প্রবেশ করা কেবল কষ্টকরই নয়, অসম্ভবও বটে। শংকরাচার্য উপনিষদের অদ্বৈতবাদের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। শংকর বলেছেন : ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব পরাপর। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগৎ ব্রহ্মের মায়িক বিকাশমাত্র। তিনি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলে আখ্যাত করেছেন। শংকরাচার্যের একথার পূর্বাভাস আমরা উপনিষদে লক্ষ্য করি। ছান্দোগ্য উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও সর্বব্যাপক জগতের আদি কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৩] সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদের শেতকেতু ও আরুণির সংলাপ থেকে আমরা এ-সত্য জানতে পারি।[৫৪] বৃহদারণ্যক

---

৫১. **কঠোপনিষদ** – ২ : ৩ : ১৯

৫২. ঐ – ২ : ২ : ১১

৫৩. **ছান্দোগ্য উপনিষদ** – ৬ : ২ : ১১

৫৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা সার*, ঢাকা, ১৯৬৬,পৃ. ৭

উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর সংলাপ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম এমন এক অনপেক্ষ সত্তা, যা দৃষ্ট, শ্রুত ও জ্ঞাত হলেই সব কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়।[৫৫] আত্মা ও ব্রহ্মের সম্পর্ক বিষয়ে শংকরাচার্যের মতবাদের সাথে ছান্দোগ্য, মুক্তি, কঠ, শেতাশ্বতর ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের অপূর্ব সাযুজ্য রয়েছে। শংকরাচার্যের মায়াবাদের ভিত্তিও উপনিষদে নিহিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য ব্রহ্ম বিভিন্ন রূপ অনুযায়ী রূপান্তরিত হন। কেননা জীবাত্মার দেহে দশটি এমনকি শতাধিক ইন্দ্রিয় অশ্বের মতো যোজিত আছে।[৫৬] শংকরাচার্য তাঁর মায়াবাদের সমর্থনে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এ শ্লোকের অবতারণা করেন। কঠ এবং মাণ্ডূক্য উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোকেও মায়াবাদের কথা উল্লিখিত আছে। উপনিষদের এ সকল শ্লোকের আলোকেই শংকরাচার্য মায়াবাদের অবতারণা করেন।

স্বামী রামানুজের দর্শন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। শংকরাচার্যের দর্শনের মতো রামানুজের দর্শনও উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। রামানুজ তাঁর বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে পরমতত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করে ব্রহ্মকে স্বগুণ রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু ব্রহ্ম সত্য, তাই তাঁর সৃষ্টিও সত্য। তিনি মনে করেন ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ, এ দুটি বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। চিৎ থেকে চেতন পদার্থের সৃষ্টি, আর অচিৎ থেকে অচেতন পদার্থের সৃষ্টি। রামানুজের এ ধরনের বক্তব্যের সাথে শেতাশ্বতর উপনিষদের মিল লক্ষ্য করা যা। রামানুজ ঈশ্বরকে প্রকৃতির আত্মা বলে গ্রহণ করেছেন। উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে জীব ও প্রকৃতি উভয়েরই আত্মা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া রামানুজের মোক্ষ বিষয়ক মতেও উপনিষদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের প্রচলিত মতবাদগুলো যে কেবল উপনিষদ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে তাই নয়, বরং উপনিষদ ব্যতীত ভারতীয় দর্শন যে অসম্ভব একথাই স্বীকার্য। এ কারণেই কোনোরূপ অতিশয়োক্তি না করে একথা বলা যায় যে, ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মূল উৎস হলো

---

৫৫. **বৃহদারণ্যক উপনিষদ** – ৪ : ৬ : ২

৫৬. রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষশায়
ইন্দ্রো মায়াভি : পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তাহ্যস্য হরয়: শতাদশা।
বৃহদারণ্যকোপনিষদ – ২ : ৫ : ১৯

উপনিষদ।[৫৭] কি আস্তিক, কি নাস্তিক উভয় সম্প্রদায়ই উপনিষদের কাছে ঋণী। আস্তিক দর্শনগুলো উপনিষদের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল, আর নাস্তিক দর্শনগুলো পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এ কারণেই প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ব্লুমফিল্ড মন্তব্য করেছেন, "ভারতবর্ষে এমন কোনো সুসংগঠিত দার্শনিক চিন্তাধারা পাওয়া যায় না, উপনিষদে যার মূল নিহিত নেই। নাস্তিক ধারাগুলোকেও উপনিষদ প্রভাবিত করেছিলো। ভারতবর্ষের বাইরেও উপনিষদের অলঙ্ঘনীয় প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। শেলিঙ, শোপেনহাওয়ার ও ম্যাক্সমুলার উপনিষদ কর্তৃক দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই উপনিষদকে যথার্থ অর্থেই ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় দার্শনিক সাহিত্য বলে আখ্যাত করা যায়।"[৫৮]

বেদাঙ্গ

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ নিয়ে যে বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি, তার অনুশীলনের সহায়ক হিসেবে এখানে আরো কিছু রচনার উদ্ভব হয়েছিলো, যাদের আলোচনা না করলে বৈদিক সাহিত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সামগ্রিকভাবে এ রচনাগুলো 'বেদাঙ্গ' নামে পরিচিত। এক কথায় যা বেদের অঙ্গ তা বেদাঙ্গ। বিদ্বানদের মতে, বৈদিক সাহিত্য ও উত্তর-বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে যুগসূত্রস্বরূপ উদ্ভব ঘটে এদের। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্বেই এদের সৃষ্টি। এগুলো মানবরচিত বলে বৈদিক সংস্কৃতিতে এরা পৌরুষেয় হিসেবে স্বীকৃত। বিশিষ্ট মুনি-ঋষি ও সাধু-সন্ন্যাসী এদের রচয়িতা।

বেদাঙ্গ ছয়টি। যথা – শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং কল্প। শিক্ষা ও ছন্দ এসেছে বৈদিক সাহিত্যের স্বাধ্যায় বা পঠন-পাঠনের প্রয়োজনে। ব্যাকরণ ও নিরুক্ত এসেছে বৈদিক সাহিত্যের অর্থবিজ্ঞান বা অর্থোপলব্ধির প্রয়োজনে। আর জ্যোতিষ ও কল্প এসেছে বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে। *'পাণিনীয় শিক্ষা'* নামক গ্রন্থে বেদকে পুরুষ হিসেবে কল্পনা করে শিক্ষাকে 'নাসিকা', ছন্দকে তার 'পদযুগল', ব্যাকরণকে তার 'মুখমণ্ডল', নিরুক্তকে তার 'কর্ণযুগল', জ্যোতিষকে তার "নেত্রযুগল' এবং কল্পকে 'হস্তযুগল' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৯]

৫৭. S. Radhakrishnan., *op. cit,* পৃ. ৫৫

৫৮. M. Bloomfield, *op. cit,* পৃ. ০১

হয়েছে।[৫৯] মুণ্ডক উপনিষদেই প্রথম বেদাঙ্গগুলোর একটি নামীয় তালিকা পাওয়া যায়। সেখানে বিদ্যাকে 'পরাবিদ্যা' ও 'অপরাবিদ্যা' নামে দুভাগে বিভক্ত করে চতুর্বেদ ও বেদাঙ্গের জ্ঞানকে অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৬০] তাই বেদাঙ্গগুলোকে কিছুতেই বৈদিক সাহিত্যের আপতিক বিষয়রূপে গণ্য করা যায় না।

বেদাঙ্গগুলোর সর্বপ্রথম উল্লেখ আমরা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে দেখতে পাই। সেখানে বৈদিক সাহিত্যকে দেহ, আর বেদাঙ্গগুলোকে সেই দেহের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬১] প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এফ. ম্যাক্সমূলার বেদাঙ্গগুলোকে উপনিষদ পরবর্তী যুগের রচনা বলে অভিহিত করেছেন।[৬২] তাঁর মতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দের কোনো এক সময়ে বেদাঙ্গগুলো রচিত হয়েছিলো। প্রফেসর ম্যাকডোনেল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ২০০ অব্দের মধ্যে বেদাঙ্গগুলো রচিত হয়েছে বলে মনে করেন।[৬৩] তবে সে যাই হোক, বেদাঙ্গগুলোর রচনা নিয়ে উপর্যুক্ত মতভেদ থাকলেও এগুলো যে উপনিষদ পরবর্তী রচনা, একথা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত।

শিক্ষা

বৈদিক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য শিক্ষার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। বেদবিদ্যার অনুশীলনের জন্য এর জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তৎকালে শিক্ষাগ্রহণ ও অর্পণের নির্দিষ্ট কিছু বিধি প্রচলিত ছিলো। এই বিধি অনুযায়ী শিক্ষাদানকারী আচার্যকে পূর্বোত্তর দিকে মুখ রেখে বসতে হতো এবং শিক্ষার্থীকে তাঁর কাছ থেকে শুনে বৈদিক শব্দরাশি গ্রহণ

---

৫৯. ছন্দ: পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহয় পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিমুক্তং স্রোতমুচ্যতে।।
শিক্ষাঘ্রাণং তুং বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সার্থমধীত্যেব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। **পাণিনীয় শিক্ষা** -৪১: ৪২

৬০. তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদ: সামবেদোহর্থববেদ:
শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম ।। **মুন্ডক উপনিষদ**- ১:১:৫

৬১. চত্বারোহস্যৈ বেদা: শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি ।। **ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ** - ৪ : ৭

৬২ F, MaxMuller, *op. cit.*, পৃ. ৩৯

৬৩. A. A. Macdonell., *A History of Sanskrit Literature*, New Delhi, 1962, পৃ. ৩০

করতে হতো। প্রশ্ন ওঠতে পারে আচার্যকে পূর্বোত্তর দিকে মুখ রেখে বসতে হতো কেন? এর কারণ হলো পূর্বোত্তর দিক অপরাজিতা। পূর্বদিকে দিবাকর উদিত হয় এবং উত্তরায়ণে দিবাকরের আলো ক্রমশ বেড়ে চলে। তাই পূর্ব ও উত্তর এ দুটি দিক থাকে খুবই প্রশস্ত। যাই হোক, এই বিধি অনুযায়ীই আচার্য শিক্ষার্থীদের বেদাধ্যয়ন করাতেন। আচার্য কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বেদাধ্যয়নের এই ব্যাপারটি বৈদিক সংস্কৃতিতে 'পারায়ণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতে যে শাস্ত্রে এ পারায়ণ বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচিত পর্যালোচিত হয়েছে তারই নাম শিক্ষা। ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও শিক্ষা বলতে তাই বোঝানো হয়ে থাকে। পাণিনিসূত্র অনুযায়ী √ শক্ + স =শিক্ষা। শক্ শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে সমর্থ হওয়া বা সামর্থ্য অর্জন করা। শিক্ষা বলতে আমরা এই সামর্থ্য অর্জন করাকেই প্রধানত বুঝিয়ে থাকি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সর্বপ্রথম আমরা শিক্ষা শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাই। শিক্ষার আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কি কি বিষয় থাকতে পারে তাদের একটি তালিকাও সেখানে দেয়া আছে। এই তালিকায় সংহিতাকেই শিক্ষার প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিদ্বানরা শিক্ষাকে বৈদিক সাহিত্যের ধ্বনিবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষাশাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা বৈদিক মন্ত্রের বর্ণজ্ঞান, স্বরমাত্রাসহ যথাযথ উচ্চারণের বিধিমালা লাভ করতে পারি। তাছাড়া বৈদিক মন্ত্রগুলোর সঠিক উচ্চারণ ও আবৃত্তির জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতভেদে স্বরমাত্রার পার্থক্য, উদাত্ত-অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের নির্ভুল উচ্চারণ এবং বর্ণমালার উচ্চারণ রীতি ও প্রযত্ন প্রভৃতির স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে শিক্ষার আলোচ্য বিষয়। তাই শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা এদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। প্রাচীন কালের শাস্ত্রীয় পণ্ডিত এবং ঋষি-মুনিরা বৈদিক মন্ত্র ও স্তোত্রগুলোকে খুবই পবিত্র হিসেবে দেখতেন। আর একারণেই তাঁরা এদের নির্ভুল উচ্চারণ নীতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো, বৈদিক মন্ত্রগুলোকে যদি আমরা সঠিক ও নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে না পারি, তাহলে এর অর্থ বিকৃত হবে এবং ইষ্টের পরিবর্তে আমাদের অনিষ্ট হতে বাধ্য।[৬৪] তাই বৈদিক সাহিত্যের সঠিক ও সার্বিক জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষাশাস্ত্র সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

---

৬৪. দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো, বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থবাহ। **পাণিনীয় শিক্ষা**- ৫২; **মহাভারত** – ১ : ১ : ১

শিক্ষাশাস্ত্র যে একটি প্রাচীনতম বিষয় তার প্রমাণ হিসেবে শ্রীমৎ অনির্বাণ প্রাচীন প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থগুলোর উল্লখ করেছেন।[৬৫] সংহিতা গ্রন্থের প্রতিটি শাখাতেই এরূপ গ্রন্থ ছিলো বলে বিদ্বানরা এদের প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত করেছেন। মহর্ষি শৌণক রচিত ঋকবেদ সংহিতার অন্তর্গত প্রাতিশাখ্যের নাম শাকল প্রাতিশাখ্য। অনির্বাণের মতে শুরুতে এটি সূত্রগ্রন্থ হিসেবে এলেও পরে একে ছন্দরূপ দেয়া হয়। সাম-প্রাতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধ সূত্র এবং ঋকতন্ত্র ব্যাকরণ হচ্ছে সামবেদের অন্তর্গত প্রাতিশাখ্য। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যসূত্র। শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত কাত্যায়ন রচিত গ্রন্থের নাম রাজসনেয় প্রাতিশাখ্যসূত্র। অথর্ববেদের অন্তর্গত দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এদের নাম অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্যসূত্র এবং শৌণকীয় চতুরধ্যায়িকা। এ ছাড়া আরো অনেক শিক্ষাগ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো ছন্দে রচিত। সেগুলোর মধ্যে ঋকবেদ ও যজুর্বেদের অন্তর্গত পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদের অন্তর্গত নারদশিক্ষা, কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত ব্যাসশিক্ষা, শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, এবং অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডূক শিক্ষা অন্যতম। এগুলোর মধ্যে ঋকবেদ ও যজুর্বেদের অন্তর্গত পাণিনীয় শিক্ষাকে বিদ্বানদের কেউ কেউ প্রাতিশাখ্যেরও পূর্ববর্তী রচনা বলে মনে করেন।

ছন্দ

বৈদিক স্তোত্র মন্ত্রকে নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে হলে ছন্দের ভূমিকা অপরিহার্য। ঋক সংহিতা, সাম-সংহিতা ও অথর্ব-সংহিতা প্রায় সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। কেবল যজুর্বেদের গদ্যময় মন্ত্রগুলো ছাড়া বাকি সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। বিদ্বানদের মতে বৈদিক ছন্দ অক্ষর সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। বৈদিক মন্ত্রের এক এক পাদে পরিমিত অক্ষর সন্নিবিষ্ট হয় এবং এক এক পাদের এই নির্দিষ্ট অক্ষর সংখ্যা থেকেই এক একটি ছন্দের উৎপত্তি হয়। বৈদিক ছন্দের সংখ্যা প্রধানত সাত। যেমন, গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। গায়ত্রী এদের মধ্যে সব থেকে স্বল্পাক্ষরা। তিনটি পদে আটটি করে অক্ষর নিয়ে মোট চব্বিশটি অক্ষর সমেত গায়ত্রী ছন্দ গঠিত। অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে ঋকবেদে যে সকল মন্ত্র দেখা যায়, সেগুলো গায়ত্রী ছন্দে লিখিত। এজন্যই কোনো কোনো ব্রাহ্মণে গায়ত্রীকে অগ্নির নিজস্ব ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৬৫. অনির্বাণ, *বেদ-মীমাংসা*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ২৫৭–৫৮

গায়ত্রী ছন্দের উদাহরণ নিম্নোক্তভাবে দেয়া যায় :

অগ্নিমিলে পুরোহিতং = ৮ অক্ষর

যজ্ঞস্য দেবম্‌ত্বিবাম = ৮ অক্ষর

হোতারং রত্নধাতমম্ = ৮ অক্ষর

গায়ত্রী ছন্দের পর আআর সংখ্যা চার করে বৃদ্ধি করলে পরবর্তী ছন্দগুলো পাওয়া যায়। যেমন, উষ্ণিক- ২৮, অনুষ্টুপ – ৩২, বৃহতী – ৩৬, পংক্তি – ৪০, ত্রিষ্টুপ – ৪৪ এবং জগতী–৪৮।[৬৬]

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশের বিভিন্ন স্থানে ছন্দশাস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশিত হতে দেখা যায়। শাকল প্রাতিশাখ্যের অন্তে, সামবেদের নিদান সূত্রে, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে এবং বিভিন্ন অনুক্রমনিকাতে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ রয়েছে। এ সকল উল্লেখ থেকে ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি যে অতি প্রাচীন কালে হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কোনো কোনো বিদ্বানের মতে পিঙ্গল মুনি রচিত ছন্দ:সূত্রই ছন্দশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এর প্রথম চার অধ্যায়ের কিছু দূর পর্যন্ত বৈদিক ছন্দের প্রসঙ্গ আছে, তারপরেই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লৌকিক ছন্দের বিবরণ। এ কারণেই অনেকে বেদাঙ্গ হিসেবে বিচার করে একে অর্বাচীন কালের রচনা বলে মন্তব্য করেছেন।

ব্যাকরণ

বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় বেদাঙ্গের নাম ব্যাকরণ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উক্ত আছে শুরুতে বাক্ ছিলেন অব্যাকৃতা। দেবতাদের অনুরোধক্রমে ইন্দ্র বাককে ব্যাকৃতা – বাক্য, পদ, প্রকৃতি, প্রত্যয় ও সন্ধি প্রভৃতিতে বিশ্লিষ্ট করেন। সংহিতা পাঠকে পদপাঠকে ভাগ করতে গেলেও বাক্য, পদ, প্রকৃতি, প্রত্যয় ও সন্ধি প্রকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। অন্যদিকে বৈদিক মন্ত্রগুলোকে যখন যজ্ঞে প্রয়োগ করা হয় তখনও প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো পদের লিঙ্গ, বিভক্তি বিশ্লেষণ করতে হয়। পদের অর্থ ও তাৎপর্যের জ্ঞান অর্জন করতে হলে পদের স্বরূপ এবং অপভাষা বর্জন করে ভাষাকে বিশুদ্ধ করা অপরিহার্য। তাছাড়া বেদার্থ বিচার, পদের সাধুত্ব জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ

---

৬৬. শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩–৩৪

শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এক কথায় শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বাক্যরূপ, প্রকৃতি-প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে ভাষাজ্ঞান হয় না। এ সমস্ত কারণে অতি প্রাচীন কালেই ব্যাকরণের উদ্ভব হয়েছিলো।

অতি প্রাচীন কালে ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভব হলেও ব্যাকরণ বিষয়ক প্রাচীন কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বর্তমান গবেষণায় ধরা পড়েনি। প্রাচীন আরণ্যক গ্রন্থাবলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাকরণের কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ দেখা যায়। মহর্ষি পাতঞ্জলি ঋক-সংহিতার 'চত্বারি শৃঙ্গা'র মন্ত্রে ব্যাকরণশাস্ত্রের ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণশাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন পরিভাষা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এ থেকে অতি প্রাচীন কালেই ব্যাকরণ অনুশীলনের যে একটি দীর্ঘ ধারা ছিলো তা আমরা অনুমান করতে পারি। বর্তমানে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত মহর্ষি পাণিনিকৃত বিখ্যাত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রের সামগ্রিক ইতিহাসে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রতীচ্যের পণ্ডিতরাও গ্রন্থটির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

কিন্তু পাণিনির এই অষ্টাধ্যায়ী নিয়ে বিদ্বানমহলে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ গ্রন্থটিকে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁদের মতে, প্রথমত গ্রন্থখানি কোনো বৈদিক শাখার অন্তর্গত নয় ; দ্বিতীয়ত গ্রন্থটিতে পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃত ভাষার বিধিমালাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে চৌষট্টি জন পূর্বাচার্যের এবং ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্ফোটায়ন, আপিশলি, গার্গ্য, শাকটায়ন এবং শাকল্য উল্লেখযোগ্য। পাণিনির এ স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায়, ব্যাকরণের আলোচনা সে যুগে খুবই ব্যাপক ছিলো। তবে উত্তরকালে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে অনুসরণ করে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কাত্যায়ন 'কার্ত্তিক' এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। পণ্ডিতগণের মতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের কার্ত্তিক এবং পাতঞ্জলির মহাভাষ্য ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাসে তিনটি স্তম্ভস্বরূপ।

নিরুক্ত

চতুর্থ বেদাঙ্গের নাম নিরুক্ত। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে নিরুক্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ভেঙ্গে বলা।' পূর্ববর্তী বেদাঙ্গ ব্যাকরণও পদকে ভেঙ্গে পদের অর্থ বের করতে চায়, নিরুক্তের কাজও কোনো কিছুকে ভেঙ্গে তার অর্থ বের করা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাকরণ হলো শব্দানুশাসন, আর নিরুক্ত হলো অর্থানুশাসন। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দের ব্যুৎপত্তি বের করা ব্যাকরণের কাজ ; আর তার বিভিন্ন অর্থের অনুরোধে তাকে ভাঙ্গা হলো নিরুক্তের কাজ। সহজ কথায়, নিরুক্তে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও প্রয়োগকে বৈদিক মন্ত্রের উদ্ধৃতিসহ দেখানো হয়ে থাকে। তবে শব্দ ও অর্থ যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সেকারণে ব্যাকরণের সাথে নিরুক্তের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। পদকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার অর্থ আবিষ্কার করতে হয় বলে নিরুক্তকে ব্যাকরণের আশ্রয় নিতেই হয়, যদিও পদের বিশ্লেষণকে একটা বহিরাঙ্গিক ব্যাপার আর অর্থের বিশ্লেষণকে একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করা চলে। এ কারণেই বেদের অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে নিরুক্ত ব্যাকরণের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

অন্যান্য বেদাঙ্গের মতো নিরুক্তের উৎসমূলেও রয়েছে ব্রাহ্মণ। বিশেষ করে শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় আরণ্যক হচ্ছে নিরুক্তের উৎসভূমি। গবেষকদের মতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন ব্রাহ্মণে ছয় শতাধিক শব্দের নির্বাচন লক্ষ্য করা যায়। ঋক-সংহিতায়ও কিছু কিছু নির্বাচন আমরা দেখতে পাই। নিরুক্তের রচয়িতা হিসেবে যাস্কাচার্যের নাম অনেকেই উল্লেখ করেছেন। বিদ্বানদের মতে নিরুক্ত মূলত নিঘন্টুর ব্যাখ্যা। যাস্কাচার্যের নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করার পূর্বে নিঘন্টু নামে এক ধরনের গ্রন্থ ছিলো, যেখানে অর্থজ্ঞানের কোনো অপেক্ষা না রেখে বৈদিক শব্দাবলি সঙ্কলিত হয়েছিলো। নিঘন্টুকে বলা যায় বৈদিক শব্দকোষ। এ-ধরনের একাধিক নিঘন্টু সে যুগে প্রচলিত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে তার মধ্যে মাত্র একটি নিঘন্টু প্রচলিত আছে, যার ব্যাখ্যা-গ্রন্থ হিসেবেই যাস্কাচার্য রচনা করেন তাঁর **নিরুক্তম** গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে এক এক বস্তুর যত নাম হতে পারে, সেগুলোকে একত্রে সাজিয়ে তাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিশ্লেষণ করেছেন। বৈদিক কোন্ পদ মন্ত্রে কোন্ বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিরুক্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৈদিক মন্ত্রেরও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

যে নিঘন্টুর ওপর যাস্কাচার্যের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ **নিরুক্তম্** রচিত, সেই নিঘন্টু তিনটি কাণ্ডে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায় নিয়ে যে কাণ্ডটি গঠিত তাকে

বলে 'নৈঘন্টুক কাণ্ড'। নৈঘন্টুক কাণ্ডে রয়েছে একার্থবাচক শব্দের সংগ্রহ। বিদ্বানদের মতে, নৈঘন্টুক কাণ্ডটিই হচ্ছে আসলে নিঘন্টু। চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে দ্বিতীয় কাণ্ড গঠিত, যাকে 'ঐকপদিক' বা 'নিগম' কাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ কাণ্ডে রয়েছে একার্থক এক একটি শব্দের সংগ্রহ। আর পঞ্চম ও শেষ অধ্যায় নিয়ে 'দৈবত' কাণ্ড গঠিত। এ কাণ্ডে রয়েছে বেদোক্ত দেবতাদের নামের সংগ্রহ। যাস্কাচার্যের নিরুক্তও বারোটি অধ্যায় নিয়ে দুটি ষটকে বিভক্ত। প্রথম ষটকে নিঘন্টুর নৈঘন্টুক কাণ্ড ও নিগম কাণ্ডের এবং দ্বিতীয় ষটকে দৈবত কাণ্ডের ব্যাখ্যা রয়েছে। যাস্কাচার্যের এ গ্রন্থে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত প্রভৃতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য, শব্দের নিত্যতা বিচার এবং বেদোক্ত দেবতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বৈদিক দেবতাদের উৎপত্তি বিষয়ে তিনি এ গ্রন্থে যে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বেদের বহু দেবতা যে আসলে একই মহান পরমাত্মার অংশবিশেষ, এ বিষয়ে তিনি যে মতামত দিয়েছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

বিদ্বানরা খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যে যাস্কাচার্যের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ এ অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, যাস্কাচার্যই নিঘন্টু ও নিরুক্ত উভয় গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের বক্তব্য আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নয়। নিঘন্টু যে যাস্কাচার্যের পূর্ববর্তী রচনা এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে, নিঘন্টু তাঁর পূর্ববর্তী রচনা। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সুপ্রাচীন ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ নিয়ে নানা রকম মতভেদ দেখা দিয়েছে ; কেননা যাস্কাচার্য এ জাতীয় নানা মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই নিঘন্টুর রচনাকাল নিরুক্তের চেয়ে আরো পুরনো।[৬৭] তাছাড়া যাস্কাচার্য নৈরুক্তবাদী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন নিরুক্তকার হিসেবে তিনি শাকপূণি, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্বাচার্যের নামও উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁদের রচিত কোনো গ্রন্থ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। যাস্কাচার্যের নিরুক্ত গ্রন্থটি এ বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে সুধীমহলে সমাদৃত।

জ্যোতিষ

পঞ্চম বেদাঙ্গের নাম জ্যোতিষ। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সময়জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

---

৬৭. দেবীপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৮

জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমেই সময়জ্ঞান লাভ করা যায়। শ্রৌত ও গার্হস্থ্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট তিথি, নক্ষত্র, সংক্রান্তি ও সংবৎসর সম্পর্কে প্রত্যেক গৃহীর জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য। জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমেই এ ধরনের জ্ঞানলাভ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে এখানে আমরা দর্শপৌণমাসীয় যজ্ঞের কথা বলতে পারি। দর্শ মানে অমাবস্যা, আর পৌণমাস মানে পূর্ণিমা তিথি। তাই দর্শপৌণমাসীয় যাজ্ঞ মানে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। প্রতি চতুর্থ মাসের ঋতুর শেষে এক বৎসর ধরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। এভাবে এমন অনেক যজ্ঞানুষ্ঠানের অস্তিত্ব আমরা পাই, যাদের অনুষ্ঠানের সময়কাল সম্পর্কে অবগত হতে হলে জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।

ঋতুভেদে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানের নির্দেশ আমরা ব্রাহ্মণ থেকেও পেয়ে থাকি। যেমন অগ্নি স্থাপনের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ বসন্ত ঋতুতে, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং বৈশ্য শরৎ ঋতুতে অগ্নির আধান করবেন বলে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৬৮] তাই যথার্থ সময়ে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ঋতু, মাস, সপ্তাহ, দিবস, সংবৎসর প্রভৃতির জ্ঞান অপরিহার্য। জ্যোতিষশাস্ত্র থেকেই আমরা এ জ্ঞান লাভ করে থাকি। বিদ্বানদের মতে, এ কারণেই প্রাচীন কালে একটি স্বতন্ত্র বেদাঙ্গরূপে জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিলো। তবে বেদাঙ্গ হিসেবে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীন কোনো গ্রন্থ আমরা পাইনি। এ বিষয়ে বর্তমানে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায়, তা অপেক্ষাকৃত উত্তরকালীন রচনা বলেই মনে হয়। এর দুটি রূপ রয়েছে। প্রথমত ঋকবেদীয় রূপে এবং দ্বিতীয় যজুর্বেদীয় রূপে। ঋকবেদীয় রূপটি ছত্রিশটি শ্লোক নিয়ে গঠিত, আর যজুর্বেদীয় রূপটি তেতাল্লিশটি শ্লোক নিয়ে গঠিত।

কল্প

বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োগ এবং সেই যজ্ঞভাবনার আদর্শে জীবন ও সমাজকে গড়ে তোলার বিধান যে শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাকেই বলে কল্পশাস্ত্র। বৈদিক সাহিত্যে এটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ বেদাঙ্গ। এটি বৈদিক কর্মানুষ্ঠান বিষয়ক বেদাঙ্গ। নির্ভুলভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পদ্ধতির আলোচনা নিয়ে কল্পশাস্ত্র গঠিত। শুরুতে ব্রাহ্মণ সাহিত্যেই এ জাতীয় আলোচনা বিস্তারিতভাবে ছিলো। কিন্তু

৬৮. **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ** – ১ : ১ : ২ : ৬–৭

উত্তরকালের পুরোহিতদের পক্ষে এ জাতীয় বিস্তারিত আলোচনা মুখস্থ করে মনে রাখা খুব দু:সাধ্য ছিলো বলেই সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক আলোচনাকে ধরে রাখার জন্য কল্পসূত্র রচিত হয়। কল্পের মধ্যে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া কল্পসূত্রে বৈদিকদের জীবনদর্শনের একটা সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে কিন্তু এ ধরনের জীবন দর্শনের পরিচয় লাভের আশা করা যায় না। কেননা ব্রাহ্মণ অপৌরুষেয় শ্রুতি বলে তার মধ্যে শ্রৌতকর্মই প্রধান। কিন্তু কল্পসূত্রের অধিকার স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ থেকে বিস্তৃত। তাই কল্পসূত্রই বৈদিক জীবনদর্শনের এক সার্থক পরিচায়ক।

বৈদিক যাগযজ্ঞ বা কর্মানুষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার আলোচনার রীতিও তাই বিভিন্ন। আর এ কারণেই কল্পসূত্রও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। শাস্ত্রকাররা কল্পসূত্রকে চারভাগে বিভক্ত করে দেখেছেন। যেমন – শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র এবং শুল্বসূত্র। যে কল্পসূত্রে শ্রৌতযজ্ঞের আলোচনা পাওয়া যায় তাকে বলে শ্রৌতসূত্র। যেমন ব্রাহ্মণ স্মৃতিতে যেসব যজ্ঞের বিবরণ আছে তার সুসংবদ্ধ বিবৃতি রয়েছে শ্রৌতসূত্রে। সাতটি হর্বিযজ্ঞ ও সাতটি সোমযজ্ঞ, এই চৌদ্দটি হলো শ্রৌতযজ্ঞ। এদের বিবরণই রয়েছে শ্রৌতসূত্রে। যে কল্পসূত্রে গৃহ্যযজ্ঞের আলোচনা পাওয়া যায় তাকে বলে গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে ঔপাসন হোম বৈশ্বদেব প্রভৃতি পৃথক সাতটি পাকযজ্ঞের বিধান রয়েছে। এছাড়াও গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত মানুষের জীবনব্যাপী অনুষ্ঠেয় নানা সংস্কারের বিবৃতিও তাতে রয়েছে। এ সকল সংস্কারের মধ্যে জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপয়ন, বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় কল্পসূত্রের নাম ধর্মসূত্র। যে কল্পসূত্রে ন্যায় অন্যায়, কর্তব্য–অকর্তব্য, দেশাচার–লোকাচার প্রভৃতির আলোচনা রয়েছে তাকে বলে ধর্মসূত্র। বৈদিক সমাজের বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিবরণ রয়েছে ধর্মসূত্রে। এরপর রয়েছে শুল্বসূত্র। শুল্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে মাপজোকের সুতো গজফিতা ইত্যাদি। বৈদিক যাগযজ্ঞের বেদির মাপজোক কি রকম হবে তার আলোচনা ও বিবরণ যে কল্পসূত্রে রয়েছে তাকে বলে শুল্বসূত্র। বিদ্বানগণ শুল্বসূত্রকে ভারতীয় জ্যামিতিশাস্ত্রের আদিগ্রন্থ বলে মনে করেন।

এখন দেখা যাক, কোন্ বেদে কি ধরনের কল্পসূত্র অন্তর্ভুক্ত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিটি বেদের সাথেই একাধিক কল্পসূত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

যাদের সমবায়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল সূত্র-সাহিত্য।[৬৯] নিম্নোক্ত তালিকার মাধ্যমে কোন্ কল্পসূত্র কোন্ বেদের অন্তর্গত তা দেখানো যেতে পারে।

বেদ	শ্রৌতসূত্র	গৃহ্যসূত্র	ধর্মসূত্র	শুল্বসূত্র
ঋকবেদ	১.শাঙ্খায়ন ২. আশ্বলায়ন	১. শাঙ্খায়ন ২. আশ্বলায়ন	–	–
সামবেদ	১. মশক ২. লাট্যায়ন ৩. দ্রাহ্যায়ন	১. গোভিল ২. খাদির ৩. জৈমিনীয়	গৌতম	–
কৃষ্ণযজুর্বেদ	১. বৌধায়ন ২.রাধূল ৩. ভারদ্বাজ ৪. আপস্তম্ব ৫. হিরণ্যকেশি ৬. বৈখানস ৭. কাঠক ৮. মানর ৯. রারাহ	১. বৌধায়ন ২. রাধূল ৩. ভারদ্বাজ ৪. আপস্তম্ব ৫. হিরণ্যকেশি ৬. বৈখানস ৭. কাঠক ৮. মানর ৯. রারাহ	১. বৌধায়ন ২. আপস্তম্ব ৩. হিরণ্যকেশী ৪. বৈখানস – – – – –	১.বৌধায়ন ২. আপস্তম্ব ৩. হিরণ্যকেশি ৪. কাঠক ৫. মানর ৬. রারাহ – – –
শুক্লযজুর্বেদ	কাত্যায়ন	পারস্কার	–	কাত্যায়ন
অথর্ববেদ	বৈতান	কৌশিক	–	–

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ ধারায় প্রাক-বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যের অবদান নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আমরা

৬৯. M. Winternitz., *op. cit,* পৃ. ২৭

প্রাক-বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট পর্যায় উল্লেখ করে এদের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা একথা বলার চেষ্টা করেছি যে, আজ আমরা যাকে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করছি, তা কেব বৈদিক সাহিত্য বা কেবল প্রাক-বৈদিক সাহিত্যের একক সরল বিকাশ নয়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বর্তমান স্তরে এসে পৌছেছে। এর বিকাশ ধারায় একদিকে রয়েছে বৈদিক উপাদান, অন্যদিকে রয়েছে প্রাক-বৈদিক উপাদান। বহুদিন পর্যন্ত প্রতীচ্যের ভারততত্ত্ববিদরা ভারতীয় দর্শনের এই প্রাক-বৈদিক উপাদানের ওপর কোনো গুরুত্ব প্রদান করেননি। তাঁরা প্রাক-বৈদিক উপাদান বলতে ভারতীয় সংস্কৃতির নিকৃষ্টতম ও আদিম দিকটিকেই বুঝতেন।[৭০] কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এ জাতীয় ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ বৈদিক উপাদানের মতো প্রাক-বৈদিক উপাদানকেও ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম ভিত্তি বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অবদান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন : "ভারত জননী এক সমন্বিত সংস্কৃতির আধার—যার প্রকাশের বাহন হচ্ছে আর্যভাষা, কিন্তু কিরাত, নিষাদ ও দ্রাবিড়গণের অবদানও আর্যগণের অবদানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমন্বিত সংস্কৃতি যেন একটি সমুদ্র যেখানে বিভিন্ন নদী তাদের জলধারাকে সংযুক্ত করেছে।"[৭১] তাই ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক-বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সাহিত্য উভয়ের অবদান স্বীকার্য।

---

৭০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪

৭১. S. K. Chatterjee, *op. cit.*, পৃ. ৯০